বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চার

মানবেন্দ্র পাল

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BAPPAR ADVENTURE

by

Manabendra Pal

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি
দিলীপ দাস

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮

স্বাতী, পিয়াল, টুটুল, মুন্না, বুবুল, তুতুল, অর্ণব,

রাহুল, দীপন, রুপো, চন্দন, ঝুমু, চিকুর,

মিঠুন ও মিলিকে—

এতে আছে—

॥ এক ॥

জায়গাটার নাম নৃপপল্লী। খুব পুরনো জায়গা। সেখানে যেমন বহুকালের পুরনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে তেমনি ছড়িয়ে আছে কত কী ভয়। চোর-ডাকাত, ভুত-প্রেত, সাপ-খোপ; তান্ত্রিক-কাপালিক, তুকতাক। এসব নিয়ে এখনো প্রায় এখানকার লোকের আলোচনা চলে।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাড়ি সেনেদের। সে আমলের বিরাট চকমেলানো বাড়ি। মাঝে উঠোন। পলস্তরাখসা বড়ো বড়ো থামগুলো যেন দাঁত খিঁচিয়ে আছে। ছাদও মস্ত বড়ো। তবে সে ছাদে কেউ ওঠে না। একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ ছাদের কার্নিস বেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাড়িটা সেনেদের। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক—এ বাড়ির সকলেই জানে তারা নাকি বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের বংশধর। অন্ততঃ সন্তু তো ইস্কুলে সেই অহংকার করে বেড়াত। মাস্টার মশাইরা

কেউ বকলে সন্তুবাবু বন্ধুদের কাছে দুঃখ ক'রে বলে, সেকেণ্ড স্যার খুব তো বকে নিলেন। উনি ভুলে যান আমি কোন্ রাজার বংশধর।

শুনে সবাই হাসে। সন্তুকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

সন্তুর ক্লাস-ফ্রেণ্ড বাপ্পা সন্তুকে আলাদা ডেকে বলে, কেউ যখন বিশ্বাস করতে চায়না তখন ওসব কথা বলতে যাস কেন?

সন্তু প্রবল প্রতিবাদ করে বলে, বা রে। আমি কি মিথ্যে কথা বলি? আমার মাকে জিজ্ঞেস করিস। মা তো মিথ্যে বলবে না। তা ছাড়া ফুড়ি দিদিমাও তো বেঁচে আছে। পাগল হলেও তাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

বাপ্পা চুপ করে থাকে।

সন্তুর এই দিদিমাও এক অদ্ভুত মহিলা। বছর পঁচাত্তর বয়েস। এখনো টক্‌টক্ করছে রঙ। তাঁর স্বামী মারা গেছেন বহুদিন। কিন্তু তিনি এখনো সধবার মতো সেজে থাকেন। সিঁথিতে এক ধ্যাবড়া সিঁদুর। পরনে সব সময়ে পুরনো বেনারসী আর গায়ে একরাশ গহনা। সেসব গহনা একালের অনেক মেয়ে চোখে দেখা তো দূরের কথা নামও বোধহয় শোনে নি। যেমন নেকলেশ, সাতনলী হার, অনন্ত, ব্রেসলেট, লিচু-কাটা বালা, কানবালা, সোনার রিঙে নথ, টায়রা এমনি কত কী। বেনারসী শাড়ির সঙ্গে এইসব গহনা পরে তিনি সব সময়ে সেজে বসে থাকেন। তিনি নিজেকে মনে করেন সেন বংশের মহারানী। তিনি মনে করেন, মহারাজ দিগ্বিজয়ে গেছেন। শিগগির ফিরবেন। তাই তিনি সব সময়ে সেজেগুজে রাজার অপেক্ষা করেন।

বাপ্পাকে বোঝাবার সময়ে সেইজন্যে সন্তু এই দিদিমার কথা টেনে আনে।—তিনি পাগল হলে কি হবে। নিজে মুখেই তো বলেন সেন বংশের তিনি মহারানী।

সন্তুর কথা ফুরোয় না। সে বলেই চলে—আমি মিথ্যে কথা বলি, না ওরা বলে? ওরা তো এমন কথাও বলে, আমাদের বাড়ি নাকি ভূত আছে। কই আমরা তো কখনো দেখি না।

বাপ্পা এবারেও চুপ। চুপ করে থাকার কারণ আছে।

এই নৃপপল্লীতে দুটি ভয় খুব বেশি। একটি ভূতের; অন্যটি ডাকাতের।

এখানকার লোকের ধারণা—এইসব পোড়ো বাড়ির আনাচে-কানাচে ভূত আছে। গভীর রাত্রে কেউ শোনে মেয়েদের পায়ের নূপুরের শব্দ। কেউ শোনে আর্তনাদ। কেউ শোনে অট্টহাসি। আর সন্তুদের ঐ বাড়িটার তো কথাই নেই। কত দিন কত জনে দেখেছে, গভীর রাত্রে সন্তুদের বাড়ির গায়ে ঐ অশ্বত্থ গাছটার ডাল ধরে কারা যেন ঝুলছে। আর ডাকাতি? সে ভয়টা ইদানিং খুব বেড়েছে। লোকের ধারণা—এসব পুরনো বাড়ির নীচে গুপ্তধন পোঁতা আছে। নৃপপল্লী মানেই তো রাজাদের পাড়া। তা গুপ্তধন থাকা সম্ভব। কাজেই ঐ গুপ্তধনের লোভে ডাকাতের দল ঘুরে বেড়াবে তা আর আশ্চর্য কী। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার কারণ সন্তুদের নিয়ে। বেচারি সন্তু নিজেও জানে না ডাকাতদের প্রধান লক্ষ্য ওদের বাড়িটাই। কারণ, প্রথমত সন্তুরা সগর্বে বলে বেড়ায় ওরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের বংশধর। কাজেই, যদিও সন্তুর বাবার সামান্য স্যাকরার দোকান আছে আর ওর মা একটা প্রাইমারি ইস্কুলের টিচার, তবুও রাজার বংশধর যখন তখন বাড়িতে গুপ্তধন থাকা অসম্ভব কিছু নয়। এ ছাড়া ডাকাতদের আরো একটা লক্ষ্য সন্তুর দিদিমা। কেননা তিনি তো লোক দেখিয়ে সর্বক্ষণ ভারী ভারী সোনার গহনা পরেই আছেন। কোনো রকমে বুড়িটাকে গলা টিপে মারতে পারলেই—ব্যস্।

এই পাগল বুড়িকে নিয়ে সন্তুর মা-বাবার ভাবনার শেষ নেই। অত বড়ো বাড়িতে দিদিমাকে বাদ দিয়ে আড়াইটে মাত্র প্রাণী। সন্তুর মা, বাবা আর ক্ষুদে সন্তু নিজে। রাত্রে যা হয় দরজাটরজা ভালো করে বন্ধ করে সবাই মিলে থাকে। কিন্তু দুপুরবেলায়? তখন তো কেউ বাড়ি থাকে না। সন্তুর বাবা সকালে উঠেই চলে যান দোকানে। দশটা বাজতে না বাজতেই সন্তু আর সন্তুর মা চলে যায় যে যার ইস্কুল। সারা দুপুর বাড়ি খাঁ খাঁ। ইস্কুলে যাবার সময়ে সন্তুর মা তাই বুড়িকে

সাবধান করে দিয়ে যায়—মা, দরজায় খিল বন্ধ করে থেকো। ঘর থেকে যেন বেরিয়ো না।

বুড়ি অমনি চটে যায়।—কী! আমি মহারাণী! আমায় কিনা বলিস ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে! কেমন ধারা মেয়ে তুই?

মহা মুশকিল। ওঁকে যত বারণ করা যায় ততই উনি দুপুরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েন। এক গা গহনা পরে রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোন।

তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে দুপুরবেলা সবাই একবার করে বাড়ি এসে বুড়ি রাণীকে দেখে যাবে। সন্তুর বাবা তো ভাত খেতে আসেনই। টিফিনের সময়ে সন্তুও আসে, সন্তুর মাও আসে। আর সন্তুর ওপর ভার—ওদের যেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাবে সেদিন যেন বাড়ি এসে আর না বেরোয়। সে কি আর সন্তুর ভালো লাগে? তবু মন্দের ভালো বাপ্পাটা সঙ্গে থাকে।

সন্তু আর বাপ্পা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। একই বয়সী। দুজনেই শ্যামবর্ণ। দুজনেই সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ায়। বেশ মিল দুজনের। কিন্তু তফাতও আছে। সন্তু একটু যেন বোকা বোকা, সরল প্রকৃতির। আর বাপ্পার বুদ্ধি কাঁচের টুকরোর মতো। চট্ করে চোখে পড়ে না, কিন্তু বেজায় ধার। সে যদি নিয়মমতো মন দিয়ে পড়াশোনা করত তাহলে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠতে পারত। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়ার বই পড়তে তার ভালো লাগে না। ভালো লাগে দেশ-বিদেশের অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ বই। সেসব বই পড়ে পড়ে ও যেমন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে তেমনি হয়েছে দুরন্ত। একবার তো ও ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে বাজি ফেলে ঘোর অমাবস্যার রাতে একক্রোশ দূরে শ্মশানে গিয়ে চিতাভস্ম নিয়ে এসেছিল। সে শ্মশান আবার যে সে শ্মশান নয়! সেখানে থাকে এক সাংঘাতিক সাধু। সে নাকি মড়ার বুকে বসে সাধনা-টাধনা করে। ভয়ে কেউ যায় না সেখানে।

আর একবার রাত্রিবেলা চোরের পিছনে ধাওয়া করে তাকে এমন

ভাবে জাপটে ধরেছিল যে বাছাধন পালানো তো দূরের কথা, কোমর থেকে ছুরিটাও বের করতে পারেনি। এইজন্যে বাপ্পাকে ছেলেরা বেশ একটু খাতির করে।

আশ্চর্য! অমন ছেলের একমাত্র বন্ধু কিনা সন্তুর মতো বোকা ছেলেটা!

আসলে সন্তুকে সবাই ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে, ওর পেছনে লাগে, সেইজন্যেই বাপ্পার যত টান বেচারি ছেলেটার ওপর।

চোর ডাকাতের ভয়ে পাড়ায় একটা ডিফেন্স পার্টি তৈরি হয়েছিল। তাতে বাপ্পাও নাম লিখিয়েছিল। অত অল্পবয়সী ছেলেকে সাধারণতঃ নেওয়া হয় না। কিন্তু বাপ্পা জোর করেই ঢুকেছিল। তার খুব ইচ্ছে—একদিন সে নিজেই ডাকাত ধরবে। তাই সে অনেক সময়ে দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দল ছুট হয়ে সরে পড়ত। একা একাই টর্চ লাঠি আর মুখে বাঁশি নিয়ে ঘুরত। কোমরে গোঁজা থাকত রিভলভারের বদলে গুলতি। আর পকেটে ছুরি। চোর ডাকাতের সামনে পড়লেই বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে ডাকবে।

এমনি ভাবে একা ঘুরতে ঘুরতে একদিন ডাকাত ধরতে না পারলেও একটা অদ্ভুত কিছু দেখে ফেলল।

সেদিন ডিফেন্স পার্টি থেকে এক ফাঁকে সরে গিয়ে একা একা চোরের সন্ধানে ঘুরছিল। এ-গলি ও-গলি ঘুরতে ঘুরতে সন্তুদের বাড়ির পিছনে আসতেই ওর লক্ষ্য পড়ল সন্তুদের বাড়ির দিকে। দেখল একটা ছায়ামূর্তি ওদের বাড়ির গায়ে সেই অশ্বত্থ গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। যেন এখনই ছাদের উপর লাফিয়ে পড়বে। দেখেই বাপ্পার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একবার ভাবল হুইসল্ বাজিয়ে দলের লোকদের ডাকে। পরক্ষণেই ভাবল, সে নিজেই ওটার মুখোমুখী হবে। দেখবে ওটা কী। এই মনে করে সে তখনই ঐ দিকে ছুটে গেল। কিন্তু বাড়ির কাছে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পেল না। তখন তার আরো ভয় করতে লাগল। তবে কি একটু আগে যা দেখল তা চোরও নয় ডাকাতও নয়—অন্য কিছু। এই 'অন্য কিছু' কী হতে পারে? যা

হতে পারে তা কি সম্ভব? সম্ভব হলে বলতে হবে—লোকে যে বলে সম্ভদের বাড়ি ভূত আছে তা তাহলে ঠিকই।

সেইজন্যে সন্তু যেদিন জোর গলায় বলেছিল, লোকে মিথ্যে মিথ্যে বলে ওদের বাড়ি ভূত আছে, সেদিন বাপ্পার মতো ছেলেও চুপ করে ছিল। সে যে নিজ চোখে কিছু দেখেছে একথা বেচারি সন্তুকে বলতে চায় নি।

দুই

অগ্রহায়ণের শেষ। বিকেল বেলা। এরই মধ্যে রোদের তেজ মিইয়ে এসেছে। আর একটু পরেই শীতের সন্ধ্যে কম্বল-জড়ানো কুঁজো বুড়োর মতো গুটিগুটি নেমে আসবে। ছেলেরা যারা মাঠে খেলাধুলো করছে তারা তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করতে ব্যস্ত। বাপ্পা বড়ো একটা খেলাধুলো করে না। চলে আসে সন্তুদের বাড়ি। সন্তুর সঙ্গে গল্প করে। নতুন পড়া ডিটেকটিভ গল্প। সন্তু নিজে পড়ে না। তবে বাপ্পার মুখে শুনতে খুব ভালো লাগে।

আজও বাপ্পা সন্তুদের বাড়ি আসছিল। ওর মা সাবধান করে দিল এই অবেলায় যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি ফিরো। দিনকাল খারাপ।

বাপ্পার কানে সে কথা ঢোকেই নি। সদ্য-শেষ-হওয়া গল্পের বইটার ঘটনা তখনো তার মগজে গজ্‌গজ্‌ করছে। সন্তুকে বেশ জাঁকিয়ে বলে না ফেলা পর্যন্ত তার যেন তৃপ্তি নেই।

হঠাৎ বাপ্পার নজরে পড়ল রাস্তায় কি একটা পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল সেটা। দেখল একটা রুদ্রাক্ষ। কাপালিক বা সন্ন্যাসীর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে। সেরকম কোনো মালা থেকে রুদ্রাক্ষটা ছিঁড়ে পড়েছে।

বাপ্পা একটু অবাক হল। এখানে হঠাৎ সন্ন্যাসী এল কোথা থেকে?

যাই হোক রুদ্রাক্ষটা বাপ্পা ফেলে দিল না। কি ভাবতে ভাবতে সেটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল।

সন্তুদের বাড়ির সামনে আসতেই বাপ্পা থমকে দাঁড়াল। দেখল সন্তু একটা চাদর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে তাদের রকে বসে এক সন্ন্যাসীকে হাত দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসীর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

তাহলে কি এই সন্ন্যাসীরই মালা থেকে খসা রুদ্রাক্ষ এটা?

বাপ্পার মাথায় একটা প্যাঁচ খেলল। সে এমনভাবে চুপিচুপি ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল যে তুজনের কেউই টের পেল না।

বাপ্পা শুনল, সন্ন্যাসী সন্তুর ডান হাতটা দেখতে দেখতে বলছে তোমার নামের প্রথম অক্ষর 'স' ঠিক কিনা?

সন্তু ভীষণ অবাক হয়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক! আমার নাম সন্তু।

তারপর সন্ন্যাসীকে ঠকাবার জন্যে হেসে বললে, আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর, বলো তো আমার বাবার নাম কি?

সন্ন্যাসী মুহূর্তখানেক চোখ বুজে কি ভাবল। তারপর বলল, পদ্মফুল।

সন্তু হেসে উঠে বলল, হল না—হল না। পদ্মফুল কখনো মানুষের নাম হয়?

সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলল, বাংলায় যে কেন ফেল কর তা আমি বুঝতে পারছি।

সন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আশ্চর্য! সে যে এবার বাংলায় ফেল করেছে সে খবর সন্ন্যাসী জানল কি করে?

সন্ন্যাসী তখন বলছে, বাংলায় জ্ঞান থাকলে জানবে পদ্মর আর এক নাম সরোজ। তোমার বাবার নাম সরোজ কিনা?

সন্তু তো একেবারে হতভম্ব। কোনোরকমে মাথা দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—তুমি ভাবছ কেন 'পদ্ম' ফুল বললাম? পদ্ম বললেই তো হত। তার কারণ, তুমি এখনই আমায় জিজ্ঞেস করবে তোমার মায়ের নাম

কি? তাই একই উত্তরে জানিয়ে দিলাম, তোমার বাবার নাম সরোজ আর মায়ের নাম পুষ্প। ঠিক কিনা?

সন্তুর গলা দিয়ে আর স্বর বেরোচ্ছিল না। কোনোরকমে বলল, হ্যাঁ।

এই সময়ে সন্ন্যাসী মুখ তুলতেই বাপ্পা দেখল সন্ন্যাসীর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আর সে মালায় একটা রুদ্রাক্ষ নেই।

বাপ্পার ভুরু কুঁচকে উঠল।

—কি এত ভাবছ সন্তুবাবু? বাড়ির কারো কথা?

—হ্যাঁ, সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠিক বলেছ। আমি দিদিমার কথা ভাবছি।

তারপর একটু থেমে বলল, আচ্ছা, তুমি পাগল সারাতে পার?

সন্ন্যাসী আবার সন্তুর হাতটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, তোমার দিদিমার যে বায়ুরোগ রয়েছে তা তো তোমার হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হাতটা মুঠো করো।

সন্তু হাত মুঠো করল।

—অত শক্ত করে নয়, আলগা করে।

সন্তু তাই করল।

এইবার সন্ন্যাসী সন্তুর মুঠো করা হাতে রুদ্রাক্ষের মালাটা একবার ঘষে দিল। তারপর চোখ বুজিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল—

"ওঁ হ্রীং খট্রাস্।

ভূতং প্রেতং পিশাচৈশ্চ ভরং

উন্মাদিনী, করালিনী, অঙ্গশোভাধারিণী

হ্রীং—পূতিগন্ধং।"

আচ্ছা, এবার মুঠো খোলো।

সন্ন্যাসী তার বুড়ো আঙুল দিয়ে সন্তুর হাতের তেলোটা ঘষে দিয়ে বলল, গন্ধ শোঁকো।

সন্তু হাতের তেলো শুঁকল।

—কোনো গন্ধ পাচ্ছ?

—হুঁ, পাচ্ছি।

—কিসের গন্ধ ?

সন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

—তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বললে, একটা প্রেতের গন্ধ পাচ্ছ না ?

সন্তু শিউরে উঠে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রকমই পাচ্ছি বটে।

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করে বললে, তোমার দিদিমার ওপর প্রেতের ভর আছে।

—প্রেতের ভর ! সন্তু চমকে উঠল।

—কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর, ওঁর মাথার গোলমাল তো অনেক দিনের।

সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বলল, তা কি আমি জানি না ? মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কি আজকের ? তাঁরই খুড়শ্বশুরের আত্মা—আচ্ছা, তোমার দিদিমার পাগলামির লক্ষণ কি কি বলতো ? একবার মিলিয়ে নিই।

সন্তু ভালো করে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে নড়েচড়ে বসে বলতে লাগল, দিদিমা সবসময়ে নিজেকে মনে করেন রাজরানী। তিনি—

বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বলল, তোমরা তো রাজারই বংশধর। তোমাদের শরীরে তো রাজা লক্ষ্মণ সেনের রক্ত। কাজেই তোমার দিদিমার নিজেকে রানী মনে করা তো পাগলের লক্ষণ নয়।

সন্তু খুশী হয়ে বলল, হ্যাঁ তাঁকে হঠাৎ দেখলে কেউ পাগল বলবে না। তবে তিনি বিধবা হয়েও সধবার মত সিঁদুর পরেন, বেনারসী পরেন, সবসময়ে গহনা—

সন্ন্যাসী হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, এই তো—এই তো পেয়েছি। বাহ্ লক্ষ্মণ সেনের খুড়শ্বশুড় ! যাবে কোথায় ? তবে ভাবনার কথাও আছে। সন্ন্যাসী একটু থামল। সন্তু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সন্ন্যাসী বললে, বাড়িতে তো তোমার মা আর বাবা ছাড়া কেউ থাকেন না ?

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, না।

—আচ্ছা, তিনি কি দোতলার পুব দিকের ঘরে থাকেন ?

সন্তু কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাপ্পা পিছন থেকে সামনে ঝাঁপিয়ে

পড়ে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার নাম কি বলুন তো ?

সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার নাম কি বলুন তো ?

—আরে বাপ্পা, তুই কখন এলি ? সন্তু খুশীতে ফেটে পড়ছিল, হঠাৎ বাপ্পার হাতের এক গাঁট্টা খেয়ে মাথা ঘুরে গেল। কেন যে হঠাৎ বাপ্পা মারল তা বোঝবার আগেই বাপ্পাকে বলতে শুনল—না,

সন্ন্যাসীঠাকুর, এটা হল না। ওতো আমার নাম বলেই দিল। আমার বাবার নামটা বলুন তো।

তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও হে ছোকরা? বলেই সন্ন্যাসী রেগে উঠে চলে গেলো।

বাপ্পা হা হা করে হেসে উঠল।

—হাসছিস যে?

—তোর আর সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখে।

—বা রে! সন্নেসী বলে কথা! যা-যা জিজ্ঞেস করলাম সব তো বলে দিল।

বাপ্পা গম্ভীরভাবে বলল, তা ঠিক। সন্ন্যাসীও সব বলে দিচ্ছিল, তুইও প্রাণ খুলে সব বলে দিচ্ছিলি।

—মানে তুই কি সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করিস না?

বাপ্পার হঠাৎ বোধহয় কিছু একটা খটকা বাধল। অন্যমনস্কভাবে বলল, চট করে একবার উপরে গিয়ে দেখে আয় তো দিদিমা কি করছেন?

হঠাৎ দিদিমার কথায় সন্তুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আজ বাড়িতে কেউ নেই। বাবা দোকানে। মা এখনো ফেরেনি। ইস্কুলে মিটিং আছে। ইস্। দিদিমাকে এতক্ষণ একা ফেলে রাখা ঠিক হয়নি।

সন্তু তখনই চাদর-টাদর ফেলে ওপরে ছুটল। গিয়ে দেখল দিদিমার ঘরের দরজা খোলা। দিদিমাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

সন্তুর গলা ঠেলে একটা ভয়ার্ত কান্না ছিটকে বেরিয়ে এল—দিদিমা—

না, ঐ তো দিদিমা ঘরেই রয়েছে। এক গা গহনা পরে দিদিমা নিচু হয়ে চৌকির নীচে কি খুঁজছে।

—দিদিমা।

—কে?

—আমি। চৌকির নীচে কি খুঁজছ?

—মহারাজের তরোয়ালখানা।

—তরোয়াল !

—হ্যাঁ, মহারাজ যাবার সময়ে একটা তরোয়াল দিয়ে গিয়েছিলেন। যদি শত্রুর চরটর কেউ আসে—

সন্তু হেসে বললে, সেরকম কেউ আসে নাকি ?

—তা আসে বৈকি। একটা ছেলে কিছু দিন ধরে ও-বাড়ির পাঁচিলে এসে বসে। আজও একটু আগে বসেছিল। আমি তাড়া দিতেই পালাল।

সন্তুর মুখ শুকিয়ে গেল। ধমক দিয়ে বলল, তোমাকে না সব সময়ে দরজা বন্ধ করে রাখতে বলা হয়েছে ? দাঁড়াও, মা আসুক।

দিদিমা অমনি রেগে উঠে বললে, তোর মাকে আমি ভয় করি নাকি ? তোরাও সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করছিস রাজরানীকে বন্দী করে রাখতে, কেমন ? দাঁড়াও মহারাজ ফিরুক।

সন্তু নিজেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে চলে গেল। বাপ্পাকে এখুনি দিদিমার কথাগুলো বলতে হবে।

নীচে নেমে এসে সন্তু অবাক। বাপ্পা কোথায় ? ও তো নেই। আর তার গায়ের চাদরটা ? বাপ্পা নিয়ে গেল ? বাপ্পা শুধু শুধু চাদরটা নিতে যাবে কেন ? নিলেও তো বলে নেবে। আর এত তাড়াই বা কিসের ?

সন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তার কেমন ভয় করতে লাগল।

॥ তিন ॥

শীতের সন্ধ্যে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে রাস্তা বেশ নির্জন। বাপ্পা একটা চাদর দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে হন্‌হন্‌ করে হাঁটছে। রাস্তা থেকে গলি, গলি থেকে পুকুরপাড়, পুকুরপাড় থেকে

আবার গলি। সন্ন্যাসীকে কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না। ঐ যে সন্ন্যাসী বাঁক ফিরল। বাপ্পাও ছুটে গিয়ে ওর পিছু নিল। অন্ধকার হয়ে গেছে বলে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীকে দেখতে পাচ্ছে না। আবার যেই দেখছে; অমনি ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী কোথায় যায় তা দেখতে হবে।

শেষে তারা এসে পড়ল সেই ভয়ংকর শ্মশানের কাছে। এখানেই একটা কালীমন্দির আছে। সেই মন্দিরে এমন এক সাধু আছে যে নাকি মড়ার বুকে বসে সাধনা করে। এই সন্ন্যাসী কি তারই কাছে যাচ্ছে? কেন? এও কি তবে কোনো সত্যি করে বড়ো সাধক? শনি মঙ্গলবারে অমাবস্যার রাতে এও কি সেই সাধুর পাশাপাশি মড়া নিয়ে বসবে?

কিন্তু সন্ন্যাসীর ওপর বাপ্পার কেমন যেন সন্দেহ। সন্তুর হাত দেখার ছল করে ও যেন দিদিমার খবর নিতে চাচ্ছিল। আসলে হাত দেখা-টেকা বুজরুকি। নইলে বাপ্পা হাত বাড়াতেই সন্ন্যাসী রেগে উঠে পালালো কেন? তাছাড়া সন্ন্যাসীর কি এমন গরজ যে বসে বসে একটা ছেলের হাত দেখে তাক লাগিয়ে দেবে? নাম-ধাম বলে দিয়ে বাহাদুরি নেওয়া ও কিছু নয়, খবর আগে থেকেই জোগাড় করে রেখেছে।

হঠাৎ বাপ্পার খটকা লাগল, তবে কি সন্তুদের বাড়ি লক্ষ্য করে কারা কোনো ষড়যন্ত্র করছে?

এ কথা মনে হতেই বাপ্পা সন্তুর জন্যে অপেক্ষা না করে তখনই সন্ন্যাসীর পিছু নিয়েছে।

পল্লীগ্রামের শ্মশান। এমনিতেই নিঝুম। তার ওপর শীতের সন্ধ্যে। জনমানবের সাড়া নেই। একটা শুধু মড়া পুড়ছিল। তাও লোকজন কাউকে চোখে পড়ল না। বর্ষাবাদলার দিনে যেমন মড়া আধপোড়া রেখেই কেউ কেউ পালায়, শীতের ভয়ে এই মড়ার সঙ্গীরাও হয়তো পালিয়েছে। কিম্বা নদীতে চান করতে গেছে।

যাই হোক চিতার আলোয় বাপ্পা দেখল মন্দিরের গায়ে একটা কুঁড়েঘর। সন্ন্যাসী সেই ঘরে ঢুকছে। বাপ্পাও তাড়াতাড়ি শর্টকাট

পথে মন্দিরের পিছনে চলে এল। এখান থেকে কুঁড়ে ঘরের পিছনের জানলা দেখা যায়। অন্ধকারে গা মিশিয়ে বাপ্পা জানলার দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁচ মিনিট কাটল—দশ মিনিট কাটল—সন্ন্যাসীকে তো দেখা যাচ্ছে না। কি হল সন্ন্যাসীর? কোথায় গেল?

এদিকে বাপ্পা মশার কামড়ে অস্থির। গায়ে চড়চাপট মেরেও যে মশা তাড়াবে তার উপায় নেই। সেই শব্দটুকুও এই মুহূর্তে সব নষ্ট করে দেবে। শুধু নষ্ট করাই নয়, তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

বাপ্পার মনে হল এতক্ষণে ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। ছেলেরা মেঝের ওপর মাদুর পেতে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে। তার মা নিশ্চয় এতক্ষণ ঘরবার করছে—ছেলে এখনো ফিরল না কেন? হয়তো একটু পরে কাউকে সন্তুর বাড়িতে পাঠাবে। কিন্তু সেখানে যখন শুনবে তার রহস্যময় অন্তর্ধানের কথা, তখন মা না জানি কি করবে?

এ কথা মনে হতেই বাপ্পার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে মায়ের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল। ভাবল—দূর ছাই! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। এখনো সময় আছে।

ঠিক সেই সময়ে তার মনে হল কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে যেন দুজন লোক নড়াচড়া করছে।

॥ চার ॥

বাপ্পাকে দেখতে না পেয়ে সন্তু কিছুক্ষণ অনেক রকম ভাবল। বাপ্পাকে তার এখনি দরকার ছিল, কেননা দিদিমা যে ছেলেটার কথা বলছিল তার কথা বাপ্পাকে বলা দরকার। পাগলের কথা বলে বাপ্পা হয়তো দিদিমার কথা উড়িয়ে দেবে—সন্তু নিজেও তেমন বিশ্বাস করে

না, তবু দিদিমা তো এমন কথা এর আগে কোনোদিন বলেন নি। তিনি যদি বলতেন, কোটালের পুত্র তরোয়াল হাতে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল তাহলে না হয় উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু—

ভাবতে ভাবতে সন্তু আবার দোতলায় চলল।

তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। সিঁড়ির মুখে এখনি অন্ধকার জমতে শুরু হয়েছে। গোয়ালে গোরুটা অসময়ে হঠাৎ হাম্বা করে ডেকে উঠল।

অন্যদিন এতক্ষণ লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। কিন্তু মা এখনো ফেরেনি, কাজেই লণ্ঠনও জ্বলেনি।

সন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দিদিমা কিছুতেই অন্ধকারে থাকতে পারে না। আলো জ্বালতে একটু দেরি হলেই চ্যাঁচামেচি করে। কিন্তু আজ চুপচাপ রয়েছে।

সন্তু বোধহয় ভেবেছিল অন্ততঃ দিদিমার ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসবে।

এটা সন্তুদের নিজেদের বাড়ি। যদিও বিরাট পুরনো বাড়ি তবু তার কোনোদিন ভয়টয় কিছু করে নি। কেন না এই বাড়িতেই তার জন্ম। ছোটোবেলা থেকে এখানেই মানুষ। এই নির্জনতা—এই অন্ধকার-অন্ধকার ভাব তার গা-সওয়া। তবু কেন যে আজ তার গা ছম্‌ছম্ করছিল তা ভেবে পেল না।

সিঁড়িগুলো সোজা উঠে ছোটো ছাদে গিয়ে পরেছে। আর এই ছাদে যাবার আগেই বাঁয়ে ঘুরলেই দিদিমার ঘর।

অন্ধকারে দেওয়াল ধরে ধরে একরকম নিঃশব্দে সন্তু উপরে উঠছিল। একটু অন্যমনস্ক ছিল। ছাদে যাবার মুখে বাঁদিকে দিদিমার ঘরের দিকে ফিরতেই হঠাৎ খুব জোরে কি যেন মুখের ওপর এসে পড়ল। চোখের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন করে উঠল। সন্তু ছিটকে সিঁড়ির ওপর পড়ল আর তখনই মনে হল কে যেন এক লাফে ছাদে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সন্তু লাফিয়ে উঠে চোর—চোর

বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছাদের দিকে ছুটল। কিন্তু তখন আর কাউকে দেখা গেল না। শুধু মনে হল বাড়ির পেছনে পেয়ারা গাছটা খুব দুলছে।

সন্তুর তখন দিদিমার কথা মনে হল। চোর ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে ও গিয়ে দাঁড়ালো দিদিমার ঘরের সামনে। দরজা ঠেলল। না, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

দিদিমা—সন্তু কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ডাকল।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। কান পেতে শুনল অস্পষ্ট একটা শব্দ। দিদিমা যেন গোঙাতে গোঙাতে কি বলছে। সন্তু দরজায় কান পেতে রইল। শুনল দিদিমা ভয়-পাওয়া গলায় আপন মনে বলছে—চোর—চোর—

দু'চার বার দরজা ধাক্কাবার পর সন্তু যখন বলল, দিদিমা, দরজা খোলো। আমি সন্তু। আলো জেলে দেব।—তখন আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। ঘরের কোণে লণ্ঠনটা ছিল। সন্তু আলো জ্বালল। সেই আলোয় সন্তু দেখল দিদিমার মুখ ফ্যাকাশে। দু'চোখে ভয়।

—কি হয়েছে?

দিদিমা ভয়ার্ত গলায় শুধু বললে—চোর—চোর—

একটু পরেই সন্তুর মা ফিরলেন। এদিকে সন্তুর চিৎকারে পাড়ার লোক ভিড় করে এসেছে। সন্ধ্যেবেলায় চোর!

দিদিমাকে বার বার জিজ্ঞেস করে যেটুকু জানা গেল তা এই—

দরজা বন্ধ করে তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। এমন সময়ে তাঁর মনে হল ঘরের কাছে কেউ চুপি চুপি ঘোরাফেরা করছে। একটু পরেই মনে হল কে যেন তাঁর দরজা ঠেলছে।—কে? বলে সাড়া নিলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। একটু পরে আবার সেই শব্দ—ঠুক্—ঠুক্—ঠুক্। কে যেন দরজা খোলবার চেষ্টা করছে। তারপরেই একটা ছুটোপাটির শব্দ। কে যেন সিঁড়িতে পড়ে গেল। তারপরই সন্তুর গলা—চোর—চোর—চোর—।

সব শুনে সবাই থ। সন্তু তখন মাকে বিকেলের ঘটনাও বলল। বাপ্পা সেই যে কখন চলে গেল আর তার পাত্তা নেই।

সন্তুর মা বললেন, ভালো বুঝছি না। তোমার বাবাকে দোকান থেকে ডেকে আনো। আর বাপ্পার বাড়ি খবর নাও—ফিরেছে কিনা।

॥ পাঁচ ॥

ঘরের মধ্যে যে দুজন রয়েছে তাদের একজন কি সেই সন্ন্যাসী? কিন্তু সন্ন্যাসীর জটা গেল কোথায়? এ তো খাসা বাবরিকাটা চুল। শুধু পরনের গেরুয়া আলখাল্লা আর গলার রুদ্রাক্ষ মালা দেখে সন্ন্যাসী বলে চেনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে তো এ জাল সন্ন্যাসী। তবে তো এর সত্যিই কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে।

এদিকে সন্ন্যাসী সাধুর সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়েছে আর ছোট্ট কলকেতে গাঁজা টানছে।

বাপ্পা ভাবতে লাগল তাহলে তো সে ঠিক সন্দেহ করে সন্ন্যাসীর পিছু নিয়েছিল। তবে কি সন্তুদের বাড়ি চুরি বা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যেই লোকটা সন্ন্যাসী সেজে খবরাখবর নিচ্ছে, ঘোরাঘুরি করছে? ঐ সাধুও কি তবে তার দলের লোক? তাহলে তো ভালো করে সব জানতে হচ্ছে।

একবার ভাবল, ছুটে গিয়ে পুলিসে খবর দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল থানা অনেক দূর। যেতে যেতে দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া ছেলেমানুষ বলে তার কথা পুলিসে হয়তো শুনবেই না। তার চেয়ে—

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলল। ঠিক করল সোজাসুজি সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবে। সন্তুকে তো একবার মাত্র সন্ন্যাসী দেখেছে। কাজেই

মুখ মনে থাকবার কথা নয়। তাহলে নিশ্চয় বাপ্পা বলে চিনতে পারবে না। আর যাতে পথে চিনতে না পারে সেইজন্যেই তো বাপ্পা সন্তর চাদরটা জড়িয়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ গিয়ে পড়লে জাল সন্ন্যাসী ধরা পড়ে যাবে। তখন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বাপ্পাকে আর ছেড়ে দেবে না। হয়তো তাকে খুনই করে ফেলবে। কাজেই জাল সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী সাজার সময় দিতে হবে। এই ভেবে বাপ্পা নাকের মধ্যে চাদরের কোণ পাকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে জোরে হেঁচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল ঘরের মধ্যে সাধু আর সন্ন্যাসী দুজনেই চমকে উঠেছে। সন্ন্যাসী তো হাঁকপাঁক করে তখনই মাথায় জটাজূট চড়িয়ে সন্ন্যাসী সেজে ফেলল। এইরকম একটা সাংঘাতিক মুহূর্তেও জাল সন্ন্যাসীর রকম দেখে বাপ্পা মনে মনে খুব হাসল। কিন্তু হাসির সময় তার নেই। এইবারই বাপ্পার কঠিন পরীক্ষা। তাকে সন্ত সেজে সন্ন্যাসীর কাছে যেতে হবে।

যতই কঠিন পরীক্ষা হোক, ভয় পাবার বা ঘাবড়ে যাবার ছেলে সে নয়। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে চাদরটা সন্তর মতো আপাদমস্তক জড়িয়ে মন্দিরটা ঘুরে বাপ্পা কুঁড়ে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পর সন্তর মতো গলা করে ডাকল—সন্ন্যাসী ঠাকুর আছ ?

—ক্যা—আ—? ভেতর থেকে সন্ন্যাসীর কর্কশ স্বর শোনা গেল।

—আমি ঠাকুরমশাই ! বলতে বলতে চাদরটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে বাপ্পা ভেতরে ঢুকল।

—কে তুই ?

—বাঃ ! চিনতে পারছেন না ? একটু আগে আমাদের রকে বসে আপনি আমার হাত দেখে নাম বলে দিলেন।

সন্ন্যাসী মুহূর্তকাল কি যেন মনে করে নিল, তার পর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বাপ্পাকে দেখে নিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে। কি যেন নাম ?

—'স' দিয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সন্তোষ।

—সন্তোষের মতো সেকেলে নাম আমার হতে যাবে কেন ঠাকুর মশাই ? আমি সন্তু। রাজা লক্ষ্মণ সেনের—

—ঐ হল। সন্তোষেরই অপভ্রংশ সন্তু। কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি তা কি করে জানলি ?

—আন্দাজ করলাম। আপনি সন্ন্যাসী মানুষ। আমাদের বাড়ি থেকে যখন পুবদিকে হাঁটা দিলেন তখনই ভাবলাম নিশ্চয় সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

বলেই বাপ্পা একবার সাধুর দিকে তাকালো। দেখল পরনে লাল কাপড়, ছাইমাখা গায়ে লাল চাদর—সাধু কট্‌মট্‌ করে তাকে দেখছে।

সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্পা ঘরের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অনেকগুলো পুরনো ছবি। দুর্গা, কালী—ছিন্নমস্তা। সব ছবিই সিঁদুর লেপা। ঘরের কোণে জলচৌকির ওপর—ওটা কি ? মড়ার খুলি ! সেটাও সিঁদুর মাখা। চোখের দুই কোটরে দুটো জবাফুল গোঁজা।

—তা এখানে হঠাৎ কি মনে করে ? সন্ন্যাসী খস্‌খসে গলায় জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে, আমার দিদিমার—

—তোমার দিদিমার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি হয়েছে ?

বাপ্পা সসংকোচে বললে, এখনো তেমন কিছু হয়নি। তবে কিছু হতে পারে।

—কি হতে পারে ?

—বিপদ।

—বিপদ ! কেন ?

—পাগল মানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। দিন-রাত এক-গা গহনা পরে বসে থাকে। আর সেসব গহনা কবেকার তা তো বুঝতেই পারছেন। খোদ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরিবারের।

সন্ন্যাসীর দুচোখ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। এই সময়ে সাধু এগিয়ে

এসে সন্ন্যাসীর কানে কানে কি বলল। সন্ন্যাসী মন দিয়ে শুনল। তার পর মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

—হ্যাঁ, তা ভয়টা কিসের ?

—বুঝতেই পারছেন কোন্‌দিন চোর-ডাকাতে এসে খুন করে গহনা নিয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী উত্তর দিল না। শুধু মুখে একটা শব্দ করল—হুঁ।

সাধু আবার সন্ন্যাসীর কানে কানে কি বলল।

বাপ্পা তখন বলছে, দেখুন না বাড়িতে কটাই বা লোক। আমাকে নিয়ে তিন জন। কেউ যদি রাত্তিরে দিদিমার ঘরে ঢুকে গলা টিপে মেরে যায় তো কাক-কোকিলেও টের পাবে না। দিদিমা তো বেশির ভাগ দিন দরজাতে খিল দিতেও ভুলে যায়।

—ছি-ছি! এটা ওঁর খুব অন্যায়। সন্ন্যাসীর স্বরে মৃদু ভর্ৎসনা।

—তা দোতলার কোন ঘরে উনি শোন ?

চকিতে বাপ্পার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে মিথ্যে করে পাশের ঘরের কথা বলল।

সন্ন্যাসী সাধুর দিকে তাকালো। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

—হ্যাঁ রে, লোকে বলে তোদের বাড়ি নাকি অনেক মোহর পোঁতা আছে ?

—তা তো বলতে পারি না। তবে জানেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, এ বাড়ির ওপর অনেকের নজর আছে।

সন্ন্যাসী চমকে উঠল। —অনেকের নজর আছে ?

—আজ্ঞে। আমার ভয় হয় কোন্ দিন বিপদ ঘটবে। আর সেই-জন্যেই ত আপনার কাছে আসা।

—তা আমি কি করতে পারি ?

—আপনি এমন কোনো মন্ত্র পড়ে দিন যাতে দিদিমার কোনো বিপদ না হয়।

সন্ন্যাসী আবার সাধুর দিকে তাকালো।

—আচ্ছা, পরে ভেবে দেখব'খন।

—পরে। না—না—

সন্ন্যাসী একরকমভাবে হেসে বললে, জান সন্তোষবাবু, আমার মনে হচ্ছে তোমার দিদিমার পরমায়ু বেশি দিন নেই। ওঁর জন্ম যদি হয় মিথুন লগ্নে তাহলে পুষ্যা নক্ষত্রের রাশি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অপঘাত মৃত্যু।

বাপ্পা যেন ভয়ে শিউরে উঠল। চিন্তিতভাবে বলল, এই সামনের মঙ্গলবার রাত্তিরে আমরা কেউ বাড়ি থাকব না। যাত্রা শুনতে যাব। দিদিমা একা থাকবে। ঐ রাতেই যদি ডাকাত পড়ে?

সন্ন্যাসী-সাধুর আবার চোখে চোখে কথা হল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল—কি বার বললি?

—মঙ্গলবার।

—তুই যে এখানে এসেছিস আর কেউ জানে?

—না না। বাপ্পা লম্বা করে মাথা নাড়ল।

—আচ্ছা, এই লোহাটা নিয়ে যা। দিদিমার দরজার পাশে রাখিস। সব ভয় কেটে যাবে।

বাপ্পা সাগ্রহে লোহাটা নিল।

—ঠাকুরমশাই, এই লোহাটা রাখলে ভূতটুত তো কিছু—

—না না, কেউ কিছু করতে পারবে না।

—বাড়িতে আবার ভূতটুতও দেখা যায় কিনা।

সন্ন্যাসী বললে—এই লোহায় সব দোষ কেটে যাবে।

বাপ্পা তখন সন্ন্যাসী আর সাধু দুজনকেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বেরিয়ে এল।

সন্ন্যাসী পিছু ডাকল—কোন্ মঙ্গলবার বললি?

বাপ্পা বলল—পরশু মঙ্গলবার।

রাস্তায় বেরিয়েই বাপ্পা হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগল। বড্ড রাত হয়ে গেছে। না জানি বাড়িতে কি ভাবনাই ভাবছে।

রাস্তা প্রায় জনশূন্য। অগ্রহায়ণ মাস। এরই মধ্যে বেশ শীত পড়ে গেছে। দু-একটা রাস্তার কুকুর শুধু ঘেউ ঘেউ করছে।

বাপ্পার মাথায় চিন্তার জট। সে যে হঠাৎ কি ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক হতে হয়! মঙ্গলবার। তার আর কত দেরি? মাঝে মাত্র একটি দিন।

বাপ্পা নিজের মনে এইসব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল হঠাৎ কিছু দূরে দেখল একটা লোকের সঙ্গে একটা ছেলে এগিয়ে আসছে। ছেলেটা কি যেন বলছে আর সঙ্গের লোকটা মন দিয়ে শুনছে।

এত রাত্তিরে ওরা দুজন শ্মশানঘাটের দিকে যায় কেন?

বাপ্পা চট করে একটা বাড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়ল। শুনতে পেল ছেলেটা বলতে বলতে যাচ্ছে—একটুর জন্য কেস গরবর হয়ে গেল। দরজাটা যদি খোলা থাকত—

ওরা চলে গেলে বাপ্পা রাস্তায় নেমে আবার হাঁটতে লাগল। এরাও কি তবে সন্ন্যাসীর দলে? কাদের বাড়ি ছেলেটা হানা দিয়েছিল?

বাড়ি পৌঁছে দেখে সেখানে সন্তু, সন্তুর বাবাও রয়েছেন। বাপ্পাকে দেখে সন্তু প্রথমেই লাফিয়ে উঠল—ঐতো বাপ্পা! উঃ, বাঁচলাম।

বাপ্পার বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বাপ্পা দেখল সত্যি কথা বললে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। তাই মিথ্যে কথা বলল—ও পাড়ায় বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম অঙ্ক কষতে।

তার পর সন্তু যখন সন্ধ্যেবেলার ঘটনা বলল তখন বাপ্পা গম্ভীর হয়ে গেল। মনে মনে বলল, তাহলে ওরা কাজে নেমে পড়েছে। দেখাই যাক।

—কি ভাবছিস? সন্তু জিজ্ঞেস করল।

—শোন্। কাল সোমবার তুই অন্তত বাড়ি থেকে বেরোস না। মাসিমাও যদি ইস্কুলে না যান তাহলে ভালো হয়।

সন্তু বলল—মায়েদের কাল হাফ হলিডে।

—বাঃ! গ্র্যাণ্ড! বাপ্পা খুশী হল।

—শুধু একটা দিন তোরা দিদিমাকে সাবধানে রাখ। ব্যস্। তার-পর আর দরকার হবে না।

সন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বললে—এমন বলছিস কেন?

বাপ্পা একটু হাসল। এ কথার উত্তর বুধবারে দেব।

॥ ছয় ॥

আজ সেই মঙ্গলবার।

সকালবেলা বাপ্পা সন্তুদের বাড়ি এসে সন্তুর মাকে বললে—মাসিমা, 'অভিমন্যু বধ' পালা হবে আজ শেতলাতলায়। আপনাদের যেতেই হবে। বলে সন্তুর মা আর বাবার নাম লিখে একটা কার্ড দিল।

যাত্রা শোনার খুব শখ সন্তুর মায়ের। কিন্তু হয়ে ওঠে না। বুড়ি মাকে ফেলে যাবে কি করে—বিশেষ রাত্তির বেলায়?

সন্তুর বাবা বললেন—আমারও যাবার ইচ্ছে। কিন্তু সমস্যা তো একই।

বাপ্পা বললে—এ পালা আমার দেখা। আপনারা যান। আমি এখানে থাকব।

বাপ্পা থাকলে আর ভাবনা নেই। সকলেই জানে ও তো শুধু দস্যি ছেলেই নয়, দায়িত্ববানও খুব। কাজেই ওদের যাত্রা শুনতে যাওয়াই ঠিক হল।

রাত আটটায় সন্তুরা খেয়েদেয়ে চলে গেল। বাপ্পা থাকল। তখন যদি কেউ ভালো করে ওর মুখ চোখ লক্ষ্য করত তা হলে দেখত কি প্রচণ্ড উত্তেজনা—কি দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে।

সবাই চলে গেলে বাপ্পা প্রথমেই দিদিমার ঘরের দরজা ঠেলে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। তখন বাইরে থেকে একটা তালাও লাগিয়ে দিল—কি জানি যদি রাত-বিরেতে দরজা খুলে বসে থাকেন। তা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল তালা লাগাবার।

এবার বাপ্পা নীচে নেমে এল। অত বড়ো বাড়িতে সে একা। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। তবু একে একে নীচের সব ঘরগুলো ভালো করে দেখল—কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। তারপর চলে গেল বাড়ির

পিছনে কম্পাউণ্ডের দিকে। সেখানে ঘণ্টাখানেক ধরে কি করল ত সেই জানে। তার পর ফিরে এল দিদিমার পাশের ঘরটায়—যে ঘরটার কথা মিথ্যে করে সন্ন্যাসীকে বলেছিল।

রাত এগারোটা।

পথ নির্জন। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূরে শেতলাতলা থেকে যাত্রার গান মাইকে ভেসে আসছে। বাপ্পা মনে মনে হাসল—সন্তরা কি এতটুকু কল্পনা করতে পারছে কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে আজ রাত্রে তাদেরই বাড়িতে!

রাত বারোটা।

অন্ধকার বাড়ি। গোটা বাড়ি থম্‌থম্‌ করছে। শুধু মাঝে মাঝে কম্পাউণ্ডের ঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। অসীম সাহস বটে—এই রকম সময়েও বাপ্পা টর্চ নিয়ে গোটা বাড়িটা আর একবার দেখে এল।

না, এখনো কেউ আসেনি।

কিন্তু—সত্যিই কি কেউ আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয় আসবে। আজ রাত্রেই সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী সদলবলে দিদিমাকে খুন করতে আসবে। আর তাদের মোকাবিলা করার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছে।

রাত একটা।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা বসে তেরো বছরের বাপ্পা। কত কি ভাবছে। হঠাৎ দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা।

বাপ্পা ভাবতে লাগল—কুকুরগুলোর হল কি? সব একসঙ্গে ক্ষেপে গেল নাকি?

কুকুরের চিৎকার ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগল। মনে হল কুকুরগুলো যেন কোনো অকল্যাণের ছায়া দেখে গৃহস্থদের সাবধান করে দিচ্ছে।

বাপ্পা আবার উঠল। টর্চ হাতে ঘর থেকে বেরোল। ওর মনে হচ্ছে, যাদের জন্যে ওর এত পরিশ্রম, এত প্রতীক্ষা তারা বোধ হয় এসে পড়েছে।

ঘর থেকে বেশী দূর এগোতে হল না। বারান্দায় পা দিতেই বড়ো ছাদের পাঁচিলের দিকে লক্ষ্য পড়ল। বাপ্পা দেখল, পিছনের অশ্বত্থ গাছ থেকে কালো কালো কয়েকটা ছায়ামূর্তি নেমে এসে পাঁচিল থেকে ভেতরে নামবার চেষ্টা করছে। দেখেই বাপ্পা চমকে উঠল। ঠিক এই দৃশ্যই সে একদিন রাত্তিরে পাহারা দিতে বেরিয়ে দেখেছিল। সেদিন ভূত বলে মনে হয়েছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সন্তুদের বাড়ি ডাকাতি করার চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চলছে।

বাপ্পা তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজাটা ঠেসিয়ে দিল, খিল বন্ধ করল না।

এইবার চলল সাংঘাতিক প্রতীক্ষার পালা। ডাকাতরা নিশ্চয় দিদিমার ঘর মনে করে এই ঘরেই আসবে—আসল ঘর তো তালাবন্ধ। তারপর বাপ্পা কি করবে ?

না, বাপ্পার এঘরে এভাবে একা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকা ঠিক হয়নি। অস্ত্রই বা পাবে কোথায় ? অস্ত্র বলতে তো পকেটে একটা ছুরি আর কোমরে গোঁজা গুলতি। এ দিয়ে কি সশস্ত্র ডাকাতদের সঙ্গে লড়া যায় ?

ভুল—ভুল হয়েছে তার। বেশী দুঃসাহস দেখাবার এই হয় পরিণতি। অথচ এখন যে পালাবে তার উপায় নেই। ওরা তো এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে আরো একটা ভাবনা হচ্ছিল—এতক্ষণ ডিফেন্স পার্টির লোকদের বাড়ির চারিদিকে এসে পড়ার কথা। সারা দুপুর ধরে বাপ্পা আজ সকলকে বলে এসেছে। ঠিক সময়ে তারা যেন এসে বাড়ির চারিদিকে লুকিয়ে থাকে। তারপর বাপ্পা যেই হুইসল্ বাজাবে অমনি যেন সবাই হৈ হৈ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু তারা এসেছে কি ? এসে তো তারা বাইরে থেকে সুতো ধরে টান দেবে আর ঘরের মধ্যে জানলায় বাঁধা ঐ ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হবে 'ঠুন্ ঠুন্'।

কই ঘণ্টা তো এখনো বাজল না। তবে কি ওরা আসে নি? তবে কি ছেলেমানুষ বলে ওর কথা কেউ কানে নেয় নি?

সর্বনাশ! ওরা যদি না এসে থাকে তাহলে কি হবে? কি করে একা লড়বে ওদের সঙ্গে? সেই মুহূর্তে মরিয়া হয়ে সে কিছু খুঁজতে লাগল—বাঁচবার শেষ চেষ্টা! আলনা থেকে টেনে নিল বড়ো একটা চাদর আর—আর ঐ যে একটা লাঠি।

কিন্তু না; আর সময় নেই। বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শব্দ এগিয়ে আসছে! বাপ্পা নিশ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

দরজায় অল্প একটু শব্দ হল ক্যাঁচ—

পুরনো ভারী দরজা খুলে গেল। একে একে ঢুকল চারজন। তাদের চোখ যেমন অন্ধকারে জ্বলছে তেমনি ঝক্‌ঝক্ করছে হাতের ছোরাগুলো। তারা খুঁজছে কোথায় সেই বুড়ি দিদিমা এক গা গহনা পরে?

ওরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। দেখতে পেল একটা চৌকি। চৌকির উপর মশারি টাঙানো। বুঝল এখানেই তাহলে বুড়ি ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে তারা এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। তার পর মশারি তুলেই চারজন ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

কিন্তু কোথায় দিদিমা? এ তো চাদর ঢাকা পাশবালিশ!

রাগে গর্জে উঠল একজন। চালাকি? খোঁজো, এ ঘরে কে কোথায় আছে?

আর দেরি নয়, এইবার বাপ্পা ধরা পড়বেই। খোলা দরজা দিয়ে বাপ্পা পালাবার শেষ চেষ্টা করবে ভাবছিল। কিন্তু তখনই দুজন ছোরা হাতে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অগত্যা—

চার ডাকাত ছুরি হাতে চকিতে ফিরে দাঁড়ালো—ঘরের মধ্যে কিসের যেন শব্দ?

হঠাৎ চমকে উঠল ওরা—কি ওটা!

দেখল একটা সাদা মূর্তি অন্ধকারে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে। কি—কি ওটা। অত ছোটো? কেউ কি চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এভাবে অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ কি হতে পারে? আর এত ছোটো মূর্তিই বা কেন? ঠিক যেন কোন ছোটো ছেলে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু ছোটো কোনো ছেলে এত রাত্তিরে ওভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে কি করছে?

হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে যেন আরো কিছুর ভয় আছে।

তবে কি—

একজন চাপা রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল—কে ওখানে?

উত্তর দিল না কেউ। হঠাৎ সেই সাদা বেঁটে মূর্তিটা লম্বা হতে লাগল। লম্বা হতে হতে ক্রমশ সরু হয়ে গেল। তারপর এক পা এক পা করে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ডাকাতরা 'রাম-নাম' জপতে লাগল। তার পর যখন সেই বিদ্ঘুটে মূর্তিটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে তখন "বাবা রে!" বলে তারা ছুটল ঘরের বাইরে।

পালালো সবাই। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এল একজন।

—হুঁশিয়ার! খুন করব—যদি আর এক পা এগোও। এ সেই সন্ন্যাসীর গলা।

বাপ্পা ভেবেছিল ভূতের ভয় দেখিয়ে ডাকাতদের তাড়িয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর চোখে ধুলো দেওয়া যায় নি। সে বুঝতে পেরেছে নিছক ভয় দেখানো হচ্ছে।

কিন্তু এখন আর উপায় নেই। সন্ন্যাসী ছুরি হাতে এগিয়ে আসছে। এবার সন্ন্যাসী ঝাঁপিয়ে পড়বে—তার আগেই বাপ্পা করল এক দুঃসাহসের কাজ। চাদর লাঠি ফেলে দিয়ে সে, বাঘ যেমন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তেমনিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর ঘাড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়েই সন্ন্যাসীর গলা কামড়ে ধরল।

সন্ন্যাসীও মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক ঝটকায় বাপ্পাকে মাটিতে

ফেলে দিল—কিন্তু ছুরিটা হাত থেকে কোথায় যেন ছিটকে

হুঁশিয়ার! খুন করব—যদি আর এক পা এগোও!

তা হোক। সন্ন্যাসী তখন তার বিরাট লোমশ শরীর নিয়ে বাপ্পার বুকের ওপর চেপে গলা টিপে ধরল। আর রক্ষে নেই—বাপ্পা দু'পা

তুলে পিছন থেকে সন্ন্যাসীর গলা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে····এমনি সময়ে জানলায় বাঁধা ঘণ্টা বেজে উঠল ঠুংঠুং—ঠুংঠুং—ঠুংঠুং।

বাপ্পা শেষ উৎসাহে দু হাত দিয়ে সন্ন্যাসীর হাত দুটো গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল—এই যে—এই ঘরে—শিগগির—

ব্যস্। তার পর বাপ্পা জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল।

বাপ্পার যখন জ্ঞান ফিরল তখন বেলা অনেক। সন্তুদের বাড়ি শুয়ে আছে। সন্তুর মা, বাবা, সন্তু, বাপ্পার বাড়ির সকলে, ডিফেন্স পার্টির রয়েছে ছেলেরা সবাই ভিড় করে।

বাপ্পা ভালো আছে দেখে সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো। তার বুদ্ধি আর সাহসের জন্যেই সন্ন্যাসী সদলবলে ধরা পড়েছে। তারা এখন থানায়।

ক'দিন পরে বাপ্পাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, সন্ন্যাসীর ওপর কখন তার সন্দেহ শুরু হয়?

বাপ্পা হাসতে হাসতে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রুদ্রাক্ষটা পকেট থেকে বের করে দেখালো। বলল—এইটে পেয়ে। আমার তখন মনে হয়েছিল, এ কেমন রুদ্রাক্ষের মালা যে রুদ্রাক্ষ ছিঁড়ে পড়ে? এ কেমন সন্ন্যাসী যে তার গলার পবিত্র রুদ্রাক্ষের মালা থেকে রুদ্রাক্ষ খসে পড়ে যায়, তবু টের পায় না? তাহলে বুঝতে হবে, এ সন্ন্যাসীর রুদ্রাক্ষের মালা ধারণের অভ্যেস নেই। আর রুদ্রাক্ষের মালাটাও ঐ 'অভিমন্যু বধের' পালায় বিবেকের গলার রুদ্রাক্ষের মতই নকল মালা।

॥ এক ॥

এমনিতেই নিজেদের গ্রামে বাপ্পার আদর খুব। ওর বুদ্ধি, সাহস আর গায়ের জোরের প্রশংসা সবাই করে। তার পর সন্তুদের বাড়ি ডাকাতির ব্যাপারটা ও যখন আশ্চর্যভাবে ধরে দিল তখন সকলে অবাক হয়ে গেল। বাপ্পার খাতিরও গেল বেড়ে। এখন কেউ কোন বিপদে পড়লেই ছুটে আসে—বাপ্পা, তুই একটু দ্যাখনা বাবা, কি করতে পারিস।

ছোটোখাটো চুরি-চামারি হলে আগে বাপ্পার ডাক পড়ে। আর ও-ও ঠিক একজন ক্ষুদে গোয়েন্দার মতো তদন্ত করে। ভালো করে পরীক্ষা করে অপরাধী কোনো পায়ের ছাপ রেখে গেছে কিনা। ইত্যাদি।

একবার ও তো একটা ঘড়ি চুরির ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে চোর ধরে দিল।

বাপ্পার সবাই বন্ধু। কিন্তু মাত্র দু-একজনের সঙ্গে তার বেশি ভাব। যেমন একজন হচ্ছে সন্তু। সন্তু কোনো অংশেই তার যোগ্য নয়, তবু ঐ যে সকলে ওর পেছনে লাগত সেইজন্যে তাকে যেন আগলে আগলে চলত বাপ্পা।

বাপ্পার আর এক বন্ধু রঞ্জু। রঞ্জু ছিল ওদের মহকুমার সাব-ডেপুটির ছেলে। বুঝতেই পারছ বেশ বড়লোকের ছেলে। আদুরে আদুরে ভাব। ওর নেশা কেবল ভালো ভালো জামা প্যান্ট কেনা।

একবার শহরে ফুটবল খেলতে গিয়ে বাপ্পার সঙ্গে রঞ্জুর খুব ভাব হয়ে গেল। রঞ্জু বললে, তুমি ডিটেকটিভ বই কত পড়তে চাও আমার বাড়িতে এসো। শার্লক হোমসের হোল ওয়ার্কস আমাদের আছে।

বাপ্পাদের গ্রাম নৃপপল্লী থেকে শহর আট মাইল দূরে। বাস আছে। কিন্তু বাপ্পা বাসের পরোয়া করে না। সাইকেলে চলে যায়।

রঞ্জুদের কোয়ার্টারে গিয়ে ওর বাবার লাইব্রেরী দেখে বাপ্পা তো অবাক। নানারকমের বই। তার মধ্যে ডিটেকটিভ বইও আছে। কিন্তু বইগুলো সব ইংরিজিতে লেখা। বাপ্পা মুশকিলে পড়ল। রঞ্জুর বাবা সস্নেহে বললেন—ঘাবড়াচ্ছ কেন? ছুটির দিনে এখানে চলে এসো। ইংরিজি বোঝবার চেষ্টা করো। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমি বলে দেব! আগেই ভয় পেলে কোন কিছু শেখা যায় না।

সেই থেকে বাপ্পা প্রায়ই রঞ্জুদের বাড়ি চলে আসে। গল্প পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রঞ্জু মাঝে মাঝে সুটকেশ খুলে দেখায় তার জামা প্যান্টের স্টক। সেও এক মজার ব্যাপার। নতুন নতুন জামায় আবার স্লিপ আঁটা—মাদ্রাজ, বোম্বে, বিলাসপুর, দিল্লি, কাশ্মীর ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে যখনই গিয়েছে সেখান থেকে ভালো জামা প্যান্ট কিনে এনে পরুক না পরুক স্টক করেছে। এটা তার এক ধরনের 'হবি'।

এবার পুজোর ছুটিতে রঞ্জুরা বেড়াতে যাবে কন্যাকুমারী। রঞ্জু বাপ্পাকে বললে, তুইও চল।

রঞ্জুর বোন ইভা ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে তো এর মধ্যেই বাপ্পার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চারের ঘটনা যত শোনে ততই আর নড়তে চায় না। ও আনন্দে নেচে উঠে বলল—বাপ্পাদা, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। সারা ট্রেনে অনেক গল্প শোনা যাবে।

রঞ্জুর বাবা-মা তো বাপ্পাকে সঙ্গে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি। ওর মতো একটা ছেলে সঙ্গে থাকলে অনেক নির্ভর।

অগত্যা বাপ্পাকে রাজি হতে হল। দীর্ঘ একুশ দিনের জার্নি। একটা ট্রাভেল-এজেন্সির সঙ্গে ওরা সবাই রওনা হয়ে গেল। ট্রাভেল-এজেন্সির সুবিধে—ওদের টাকা দিয়ে দিলে ওরাই ট্রেনে রিজার্ভড বগিতে সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ওরাই করে। টিকিট কাটা, রিজার্ভেশান করা, হোটেল খোঁজা, রিক্সা, টাঙ্গা, ট্যাক্সি ভাড়া করা—এসব প্যাসেঞ্জারদের কিছুই করতে হয় না। একটা বিরাট বগী রিজার্ভ করা হয়। জনা চল্লিশ প্যাসেঞ্জার একসঙ্গে থাকে।

সারা দক্ষিণ ভারত ঘুরে ফেরার পথে ওদের বগিটা তিরুনেলভেলি নামে অখ্যাত একটা স্টেশনে কেটে রাখা হল ভোরবেলায়। সেদিন রাত দশটায় অন্য একটা গাড়ির সঙ্গে বগিটা জুড়ে দেওয়া হবে।

ভোরবেলায় বগিটাকে সরিয়ে রাখা হল সাইডিং-এ। ব্যস্! এখন অখণ্ড অবসর। সারাদিন শুয়ে বসে সময় কাটাও।

রঞ্জু বাপ্পা ছেলেমানুষ। তারা কি আর গাড়ির খুপ্‌রির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকতে পারে? সকালে চা-জলখাবার খাবার পর রঞ্জু বাপ্পাকে বললে—চল, একটু ঘুরে আসি।

রঞ্জুর বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন—কোথায় আবার বেরোবে?

রঞ্জু বললে, এই একটু—

রঞ্জুর বাবা বললেন—তাড়াতাড়ি ফিরো। অচেনা অজানা জায়গা—

ইভা অমনি বলে উঠল—দাদা, আমিও যাব।

কিন্তু ইভার মা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বেচারি ইভা মন খারাপ করে বসে রইল। ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল।

জায়গাটা একেবারে পল্লীগ্রামের মতো। স্টেশন থেকে বেরিয়েই জঙ্গল। পাকা বাড়ি চোখেই পড়ে না। লোকের চিহ্ন নেই। যে দু'চারজন লোক দেখা গেল তারা খুবই গরিব—খেটে-খাওয়া মানুষ। মাঝে মধ্যে গোরুর গাড়ি চলেছে কাদা ভেঙে। এখানকার গোরুর গাড়িগুলো ঠিক বাংলা দেশের মতো নয়। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বাপ্পা চলছিল। হঠাৎ রঞ্জু লাফিয়ে উঠল—সরে আয়! কুকুর!

বাপ্পা দেখল একটা রোগা হাড়-জিরজিরে কুকুর তাদের পিছু পিছু আসছে। কুকুরটা নিতান্ত বাচ্চা নয়; আবার বড়োও নয়। কিন্তু চেহারা দেখলে ভয় করে। এত রোগা যে মনে হয় সত্যি করে কুকুর নয়, কুকুরের প্রেতাত্মা। তা ছাড়া রঙটাও কুচকুচে কালো। অত কালো কুকুর ওরা কখনো দেখেনি। কুকুরটা খিদেয় ধুঁকছে। আর চোখ দুটো যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

ব্যাস! বাপ্পার মন অমনি গলে গেল।

—আ—তুঃ!

এসব দেশের বেশিরভাগ মানুষই বাংলা বোঝে না। কিন্তু আশ্চর্য কুকুরটা দিব্যি বুঝল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

—কুকুরটা অনেক দিন খেতে পায়নি। বাপ্পা বলে উঠল।

তারপর পকেট থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা যেন এক নিঃশ্বাসে সেটা লুফে নিল।

বাপ্পারা তখন এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। এখানে পর পর কয়েকটা দোকান। দোকানগুলো মোটেই সাজানো গোছানো নয়। এক-একটা গাছের তলায় কাঠের ফ্রেমে দোকান। কোনোটা চায়ের দোকান, কোনোটা খাবারের। খোলা অবস্থাতেই মিষ্টিগুলো থালায় সাজানো, যেমন আমাদের দেশে গ্রাম-গঞ্জের মেলার দোকানে সাজানো থাকে। ভন্ ভন্ করে মাছি বসছে আর রাস্তার ধুলো উড়ে পড়ছে।

দোকান আছে, দোকানদার আছে—কিন্তু খদ্দের নেই। লোক কোথায়, যে জিনিস কিনবে?

দোকানে দোকানে যে লোকগুলো রয়েছে তাদের শুধু কালো কালো চেহারাই নয়, দেখতেও ভয়ংকর। এদের দুজনকে দেখে একজন দোকানি যেন অবাক হল। সে অমনি আর একজনকে ডেকে এদের দুজনকে দেখাল। তার পর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল।

এবার এদের লক্ষ্য পড়ল একটা সামান্য চায়ের দোকানে কয়েকটা সুন্দর সুন্দর জামার কাপড়ের থান ঝুলছে।

অমনি রঞ্জুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

—ভারি সুন্দর শার্টিং তো। চ' দেখি।

বাপ্পার ইচ্ছে ছিল না। বলল, সঙ্গে তো টাকা নেই।

রঞ্জু বলল, আমরা তো কিনব না, শুধু দেখব।

বাপ্পা বলল, যদি নাই কিনি তাহলে শুধু শুধু দেখে লাভ?

রঞ্জু বলল, আহা, না কিনলে বুঝি দেখতে নেই?

ওদের ঐরকম কথাবার্তা বলতে দেখে দোকানদার হাতের ইশারায় ডাকল।

রঞ্জু তো হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। বাপ্পা গেল পিছু পিছু।

দোকানদার খুব যত্ন করে শার্টিংগুলো দেখালো। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ইম্পোর্টেড গুডস্।

—তা তো বটেই। নইলে এত ভালো কাপড়?

—কত করে মিটার? How much?

—থার্টি রুপিজ ওনলি।

রঞ্জুর দুচোখ আবার লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। কিনতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু সঙ্গে টাকা নেই।

এদিকে কখন পাশের দোকানগুলো থেকে কয়েকজন যে তাদের ঘিরে ধরেছে রঞ্জু তা খেয়াল করেনি। কিন্তু বাপ্পা লক্ষ্য করেছে। সে লুকিয়ে রঞ্জুর গায়ে একটা চিমটি কাটল। অর্থাৎ সাবধান। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, দর করিস না এখন। পালিয়ে চল্।

রঞ্জু ইশারা বুঝল। আর কথা না বাড়িয়ে দোকান থেকে রাস্তায় নামল। কিন্তু জনা তিনেক লোক তাদের দিকে তাকিয়েই রইল, যেন লক্ষ্য করতে লাগল—কোথায় যায়।

বাপ্পা বলল, এখন ফেরা ঠিক হবে না। সামনের দিকে পা চালা।

চলতে চলতে রঞ্জু বলল, শার্টের কাপড়গুলো কিন্তু ভালোই ছিল। ঐ পিঙ্ক কালারটা—ওবেলা টাকা নিয়ে আসব।

বাপ্পা কোনো উত্তর দিল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ। মনে হল কেউ যেন তাদের পিছু নিয়েছে। ফিরে তাকাতেই দেখল সেই তিনজন লোক।

তারা দুর্বোধ্য ভাষায় হাত নেড়ে এদের থামতে বলল। বাপ্পা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওরা তখন কাছে এগিয়ে এল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। তিন জনেই বেশ লম্বা। ওদের একজন হাসতে হাসতে বোধহয় তামিল আর ভাঙা ইংরেজি ভাষা মিশিয়ে বললে, তোমরা চলে এলে কেন? থার্টি রুপিজ যদি বেশী মনে হয় তাহলে নয় দুটো টাকা কমই দেবে।

রঞ্জু বললে, কিনতাম। কিন্তু no money।

ওদের মধ্যে একজন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

—আমরা টুরিস্ট। কন্যাকুমারী থেকে কলকাতায় ফিরছি। রঞ্জুই উত্তর দিল।

—তা এখানে কেন?

—আমাদের বগি স্টেশনে রয়েছে। আমরা দুজন ঘুরতে বেরিয়েছি।

ওরা সবাই মন দিয়ে শুনল।

একজন বললে, বগিতে অনেক লোক আছে?

বাপ্পা বললে, At least forty. অন্তত: চল্লিশজন।

—তারা কি করছে?

—রেস্ট নিচ্ছে।

একজন বললে, O. K., তোমরা বলছ টাকা নেই। টাকা উপায় করতে চাও? service? নক্‌রি—নক্‌রি?

রঞ্জু অবাক হয়ে বাপ্পার দিকে তাকাল।

বাপ্পা উত্তর দিল—Thanks. Not now. We are students. আমরা এখন পড়াশোনা করি, চাকরি করব না।

এ কথা শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করল। তারপর ওদের মধ্যে সবচেয়ে ঢ্যাঙা লোকটা বলল, ঠিক আছে। ওবেলা টাকা নিয়ে এসো। আরো ভালো কাপড় দেখাব।

রঞ্জুর চোখ দুটো আবার জ্বল জ্বল করে উঠল। বলে উঠল—আরো ভালো?

—Yes! far better quality.

রঞ্জু খুশী হয়ে বললে, O. k.

ঢ্যাঙা লোকটা বললে, তোমরা আসবে তো? তোমাদের না হয় কুড়ি টাকা মিটারেই দিয়ে দেব।

রঞ্জু বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয় আসব।

—কখন আসবে?

—At five. পাঁচটায়।

আর ঘোরা হল না। বেলা তখন বারোটা বাজে। নাওয়া খাওয়ার সময় হয়েছে। ওরা স্টেশনে ফিরে এল।

সারা পথ বাপ্পা গম্ভীর। একটি কথাও বলল না।

প্ল্যাটফর্মে এসে বগিতে উঠতে যাবে দেখে সেই কালো কুকুরটা কখন তাদের পিছু পিছু এসে ল্যাজ নাড়ছে।

বাপ্পা আর একটা বিস্কুট দিল। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে যখন দেখল কুকুরটা তখনো প্ল্যাটফর্মে বসে ওদের বগির দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে, তখন নিজের পাতের এঁটো ভাত মাংস কুকুরটাকে খেতে দিল। কুকুরটা যেভাবে হাউ হাউ করে এক নিশ্বাসে ভাতগুলো খেয়ে ফেলল তাতে আবার মনে হল, বেচারি অনেক দিন খেতে পায়নি। আহা রে!....

বেলা তখন প্রায় আড়াইটে। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই গাড়ির মধ্যে যে যার বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বাপ্পা আর রঞ্জু দু'জনে দুটো বাঙ্ক দখল করে ডিটেকটিভ বই পড়ছে। ইভা শুয়েছিল নীচে। মায়ের পাশে। তার হাতেও একটা বই—ড্রাকুলার।

এক সময়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা বাপ্পাদা, তুমি এই ড্রাকুলা বিশ্বাস করো ?

বাপ্পা বললে, সত্যিকরে ড্রাকুলা তো ছিল আভিজাত বংশ। প্রেতাত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

দু'জনেই বাঙ্ক থেকে নেমে দরজার কাছে ছুটে গেল।

—কিন্তু এই যে দু'পাশের দুই দাঁত দিয়ে রক্ত শুষে নেওয়া

বাপ্পা বললে, ওসব আমি বিশ্বাস করি না।

—তুমি তো কিছুই বিশ্বাস করো না। ভূতটুতও না।

বাপ্পা বললে, আজ পর্যন্ত ভূত দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আমার সঙ্গে যাদের বার বার দেখা হয়েছে তারা চোর ডাকাত। সেই সন্ন্যাসী আর সাধুর ঘটনা বলেছিলাম মনে আছে তো?

—উঃ! মনে থাকবে না আবার? সাংঘাতিক।

এমনি সময়ে দুপুরের নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মে কুকুর ডেকে উঠল—ঘেউ—ঘে—উ—উ—

বাপ্পা আর রঞ্জু তড়াক করে উঠে বসল। হঠাৎ অমন করে কুকুর ডাকছে কেন? যেন সন্দেহজনক কাউকে দেখেছে।

দু'জনেই বাঙ্ক থেকে নেমে দরজার কাছে ছুটে গেল। সেই রোগা কুকুরটা এখনো যায় নি। প্ল্যাটফর্মের পিছনের দিকে কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে একটানা ঘে-উ ঘে—উ—উ করে চেঁচিয়েই যাচ্ছে।

—ঐ দ্যাখ বাপ্পা, একজন লোক ছুটে পালাচ্ছে। রঞ্জু আঙুল দিয়ে দেখাল।

—আরে! সকালের সেই লম্বা লোকটা না!

বাপ্পা লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল। কুকুরটা বাপ্পাকে দেখে খুশী হয়ে কুঁইকুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল।

—লোকটা বোধ হয় আমাদের খোঁজেই এসেছিল! হয় তো ভালো শার্টিং এনেছিল। হতভাগা কুকুরটা শুধু শুধু তাড়াল। রঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল।

বাপ্পা কোনো উত্তর দিল না। যতক্ষণ সেই লোকটাকে দেখা যায় ততক্ষণ দেখতে লাগল।

তারপর উঠে এল গাড়িতে। আবার দু'জনে উঠে বসল যে যার বাঙ্কে। রঞ্জু ডুবে গেল ডিটেকটিভ বইয়ের মধ্যে। কিন্তু বাপ্পা চোখ বুজিয়ে শুয়ে রইল।

একটু পরে ইভার গলা পাওয়া গেল। —বাপ্পাদা, একটা জিনিস দেখে যাও।

ইভা কখন যে 'ড্রাকুলা' পরিত্যাগ করে জানলার ধারে গিয়ে বসে

ছিল কেউ তা খেয়াল করেনি। বাপ্পার মনে এখন সব সময়েই খট্‌কা—কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নেমে এল। ঝুঞ্জু বোনের কথায় গুরুত্ব দিল না। বই পড়তেই লাগল।

ইভা বললে, ছাখো, কার একপাটি স্লিপার কুকুরটা মুখে করে এনেছে।

বাপ্পা দেখল সেই রোগা কালো কুকুরটা একপাটি স্লিপার প্ল্যাটফর্মের ওপাশে শুয়ে শুয়ে চিবোচ্ছে।

বাপ্পা নেমে গেল। কুকুরটা স্লিপারটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। বাপ্পা পা দিয়ে স্লিপারটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

এমনি সময়ে গাড়ির মধ্যে থেকে ভারী গলায় কে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছ বাপ্পা সাহেব ?

বাপ্পা ফিরে দেখল জানলার ধারে বসে চুরুট খাচ্ছেন মিস্টার দফাদার। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি গুরুগম্ভীর স্বর। ইনি একজন পুলিশ অফিসার। তিনিও একই গাড়িতে সপরিবারে কন্যাকুমারী বেড়াতে গিয়েছিলেন।

বাপ্পা এগিয়ে এসে বলল, একপাটি স্লিপার। কুকুরে মুখে করে এনেছে।

—তা এত খুঁটিয়ে কি দেখছ ?

—না তেমন কিছু নয়। তবে স্লিপারটা ছেঁড়া বা পুরনো নয়। প্রায় নতুন।

পুলিশ অফিসার চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ছাখো গাড়িরই কোনো ভদ্রলোকের স্লিপার কুকুরটা মুখে করে নিয়ে গেছে কিনা।

বাপ্পা মাথা চুলকে বললে, স্লিপারটা লোকের নয়, অল্প বয়সী ছেলের।

মিস্টার দফাদার হেসে বললেন, একই ব্যাপার। দরজা খোলা ছিল, কুকুরটা কখন ঢুকে এক পাটি মুখে করে নিয়ে পালিয়েছে। এখন সে বেচারি চটি কিনবে কোথায় ?

বাপ্পা এবার গাড়িতে উঠে এসে মিঃ দফাদারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—এস। বস। টফি খাবে?

বাপ্পা হাত পাতল।

—আচ্ছা কাকাবাবু, স্লিপারটা যদি গাড়ির কারো না হয়?

পুলিশ অফিসারের চুরুট টানা বন্ধ হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে বললেন, হঠাৎ এমন কথা ভাবছ কেন?

—এমনি।

একটু থেমে বললে, বলুন না। তাহলে কি হতে পারে?

মিঃ দফাদার ধীরে ধীরে চুরুটে টান দিয়ে বললেন, তাহলে বুঝতে হবে serious কিছু।

বাপ্পা সামনের সীটে বসে পড়ল।

—আপনি বলতে চাইছেন কোনো ছেলেকে তাহলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার সময়ে স্লিপারটা পা থেকে খুলে গিয়েছে!

—Exactly। তবে এসব তুমি ভাবছ কেন? এখানে এই দুপুরবেলায় কে কাকে ধরে নিয়ে যাবে? তা ছাড়া—আমরা এতগুলো লোক রয়েছি।

বুল্টু এই সময়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

বাপ্পা বললে, জায়গাটা তো নির্জন। আর ঐ দিকটা দেখুন—ঐ লেবেল ক্রসিং-এর ওপারে—শুধু জঙ্গল। একটি লোক নেই। লোক যা, তা এই গাড়িতে। তা যদি আমাদের গাড়ির ওপর কেউ নজর রাখে আর ঐ দিক দিয়ে কোনো ছেলেকে মুখ বেঁধে জোর করে কেউ ধরে নিয়ে যায়—তাহলে কি সেটা খুব অসম্ভব?

—না, তা অসম্ভব নয়। কিন্তু why? কেন?

বাপ্পা সে কথার উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় চলে এল।

বাপ্পার মুখের অবস্থা দেখে রঞ্জু ঘাবড়ে গেল। নিচু গলায় বললে, তুই কি কিছু serious ব্যাপার চিন্তা করছিস?

বাপ্পা মাথা চুলকে বললে, না। শুধু ভাবছি ওবেলার সেই লোকটার কথা। লাইনের পারে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কেন?

—কাপড় দেখাতে।

বাপ্পা ধমক দিয়ে বললে, বাজে কথা বকবি না। ওর সঙ্গে কোনো কাপড় ছিল না তা তো দেখতেই পাওয়া গেল।

রঞ্জু লজ্জা পেয়ে বললে, তবে?

বাপ্পা সে কথার উত্তর না দিয়ে বাঙ্কে উঠে বসল।

মিনিট পনেরো পর বাপ্পা বললে, তুই কি সত্যি সত্যি বিকেলে শার্টের কাপড় কিনতে যাবি?

—বাঃ, যাব না? সেই লোকটা বললে আরো ভালো কাপড় দেখাবে। তাকে কথা দিলাম।

বাপ্পা একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা মাকে সব ব্যাপারটা জানিয়ে যাস।

—তা তো যেতেই হবে। নইলে টাকা পাব কোথায়?

বাপ্পা চুপ করে রইল।

॥ দুই ॥

বিকেলে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পর ওরা বেরোতে গেলে রঞ্জুর মা বারণ করলেন। বললেন, অজানা অচেনা জায়গা, তার ওপর বৃষ্টি বাদল, অন্ধকার হয়ে আসছে। কী দরকার জামার কাপড় কিনতে যাওয়ার?

রঞ্জু বললে, বাঃ রে! তিরুনেলভেলির কিছু স্টকে রাখব না?

মা তবু আপত্তি করতে লাগলেন। রঞ্জু বললে, কাছেই তো দোকান। এখুনি চলে আসব।

বাপ্পা কিন্তু চুপ। যাবার জন্যে জেদও ধরল না, যাবনাও বলল না। একটা কথাই তখন মনে হচ্ছে, হারানো এক পাটি স্লিপারের খোঁজ কিন্তু কেউ এতক্ষণেও করল না।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাপ্পা বললে, তোর কাছে একটু কাগজ আছে?

রঞ্জু মাথা নাড়ল,—কাগজ কি হবে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বাপ্পা বললে, তুই একটু দাঁড়া।

এই বলে এক দৌড়ে গাড়িতে ফিরে এসে খাতার পাতা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি কি লিখল। তারপর কাগজটা মুড়ে চলে এল প্ল্যাটফর্মের কোণে যেখানে ট্রেনের ঠাকুররা রান্না করছে। হেড-ঠাকুরের সঙ্গে বাপ্পার বেশ ভাব। তাকে চুপি চুপি বলল, আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি। যদি শোন রাত আটটা পর্যন্ত আমরা ফিরিনি, তাহলে এটা রঞ্জুর বাবাকে দিয়ো।

ঠাকুর পান চিবুতে চিবুতে বললে, ফিরতে দেরি কোরো না খোকাবাবু। নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে হবে। দশটায় গাড়ি ছেড়ে যাবে।

বলে চিরকুটটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখল।

বাপ্পা রঞ্জুকে কিছু বলল না। দু'জনে তাড়াতাড়ি দোকানগুলোর দিকে হাঁটতে লাগল।

—কুড়ি টাকা মিটার নেবে মাকে তা বলি নি। বলেছি তিরিশ টাকাই।

রঞ্জু ফিক করে হাসল। —এ মিথ্যেতে দোষ নেই। কি বলিস?

বাপ্পা উত্তর দিল না।

—আমার কিন্তু পিংক কালারটাই পছন্দ। রঞ্জু তাকালো বাপ্পার দিকে।

বাপ্পা এবারও কিছু বলল না। বড্ড গম্ভীর হয়ে আছে।

—কি এত ভাবছিস বল্ তো? কাদা—

কাদা বাঁচিয়ে বাপ্পা ছোট্ট একটা লাফ দিল। ভাবছি লোকগুলো ওবেলা হঠাৎ চাকরির কথা বলল কেন?

—এ তো সোজা কথা। পৃথিবীসুদ্ধু লোক জানে বাঙালিরা খুব ইনটেলিজেন্ট। ওদের কাজ দিলে—

উত্তরটা যে বাপ্পার মনঃপুত হল না তা ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

—কিন্তু আমাদের যে চাকরি করার বয়েস হয়নি তা তো ওরা বোঝে।

বাপ্পা নিজের মনেই বলতে লাগল—তাহলে এমন চাকরি যা আমাদের বয়সী ছেলেদের দিয়ে করানো যায়।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। রঞ্জু সায় দিল।

—কি সে চাকরি? বাড়ির 'বয়' কিম্বা দোকানের 'সেল্সম্যান'?

রঞ্জু মুখ কুঁচকে বললে, এ ম্যা, এমন কথা ওরা ভাবল কি করে? আমরা ছাত্র। আমরা করব কি না দোকানের কাজ!

—Here is the point! বাপ্পা বলে উঠল।

—তবে ওরা কোন্ চাকরির লোভ দেখাল?

রঞ্জু একটু ভেবে বলল, হয়তো ওদের জানাশোনা কারো বড়ো অফিস আছে। সেখানে অ্যাপ্রেন্টিস—

—তুই একটা বুদ্ধু—সন্তুর চেয়েও। এই অজ পাড়াগাঁয়ে বড়ো অফিস!

রঞ্জুর আত্মসম্মানে লাগল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল—এখানে কেন? ব্যাঙ্গালোর কিম্বা মাইসোরে এদের জানাশোনা বড়ো অফিস থাকতে পারে না?

—এদেশে কি ছেলের অভাব যে চাকরির জন্যে আমাদের মতো ছুটো উট্কো ছেলেকে ব্যাঙ্গালোর পাঠাবে? তা ছাড়া ওদের ইন্টারেস্ট কি?

কথা বলতে বলতে ওরা সেই দোকানগুলোর কাছে এসে পড়ল। কিন্তু দেখল একটা দোকানও খোলা নেই।

—আশ্চর্য!

রঞ্জু বলল, আশ্চর্য আর কি। বৃষ্টি-বাদলায় বাবুরা দোকান খোলেন নি। শুধু শুধু হয়রানি!

দু'জনে এদিক ওদিক তাকাল। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। —তাহলে?

—ফেরা যাক। কথাটা বাপ্পা বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে। যেন সে ফিরতেই চায়।

কিন্তু রঞ্জু খুব দমে গেল। বলল—কী সুন্দর শার্টিংগুলো ছিল! আমাদের শার্টের কলেকসানে তিরুনেলভেলির—

কথা শেষ হল না, রঞ্জু আনন্দে লাফিয়ে উঠল—একটা টাঙ্গা আসছে না?

বাপ্পাও দেখল। —তাই তো। এখানে আবার টাঙ্গা আছে নাকি?

টাঙ্গাটা এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। গাড়োয়ানের মাথায় অদ্ভুত একটা রঙীন উঁচু টুপি—নানা রঙচঙ করা। যেন সার্কাসের ক্লাউন।

ওদের দেখে গাড়োয়ানটা হাসল। গাড়িতে উঠতে ইশারা করল।

—গাড়িতে উঠব কেন? বাপ্পা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করল।

কেউ কারো ভাষা বোঝে না। গাড়োয়ান হাত মুখের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল তাদের জন্যেই টাঙ্গা এসেছে। দু' কিলোমিটার দূরে ওদের গোডাউন। সেখানে ভালো ভালো শার্টিং মজুত করা আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে রঞ্জু তড়াক করে গাড়িতে উঠে পড়ল। বাপ্পা তখনো 'কিন্তু' 'কিন্তু' করছে। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তবু তাকে উঠতে হল। না উঠে উপায় নেই।

টাঙ্গা চলতে শুরু করল। মাথার ওপর আবার মেঘ ঘন হয়ে

উঠেছে। গাছের পাতায় পাতায় ঝোড়ো হাওয়ার তীব্র শব্দ। বাপ্পা তাকিয়ে দেখল রাস্তায় জনমানবের সাড়া নেই। শুধু তাদের টাঙ্গাটা ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে চারিদিক চকিত করে ছুটে চলেছে।

এ যে তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ছেলেমানুষ হলেও বাপ্পার তা বুঝতে বাকি নেই। নিশ্চিত বিপদের মুখে জেনেশুনে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বোকামি আর কি হতে পারে।

বাপ্পা সবই বুঝতে পারছে কিন্তু এমন এক একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন আর পিছোবার উপায় থাকে না। হঠাৎ এই টাঙ্গার আবির্ভাব—ঐ বিদ্ঘুটে টুপিপরা গাড়োয়ান—তার কালো মুখে সাদা দাঁত বের করা হাসি—আর মনের আনন্দে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারা এসবই যা প্রমাণ করে তা মোটেই শুভ ব্যাপার নয়। তবু বাপ্পার টাঙ্গায় না উঠে উপায় ছিল না। অবাধ্য হলে ঐ গাড়োয়ানটা একলাই বলপ্রয়োগ করত।

বাপ্পা এখন বুঝতে পারছে ভুল সে নিজেও কম করে নি। পাছে রঞ্জু ওর বাবা মা বোনের সামনে তাকে ভীতু বলে এই জন্যে রঞ্জুর কথায় বাধা দিতে পারে নি। তবু তার উচিত ছিল গোড়া থেকে তার যা যা সন্দেহ হয়েছিল তা পরিষ্কার রঞ্জুকে খুলে বলা। তাকে জানিয়ে দেওয়া বিকেলে জামার কাপড় দেখতে যাওয়া মানে কিন্তু নির্ঘাত বিপদে পড়া।

বিপদটা যে কিসের তা অবশ্য বাপ্পা নিজেও জানে না। কিন্তু সে যদি রঞ্জুকে স্পষ্ট করে তার মনের আশংকার কথা বলত রঞ্জু তাহলে নিশ্চয় এভাবে আসতে সাহস পেত না। আসন্ন এই বিপদের জন্যে বাপ্পা এখন নিজেকেই দায়ী করছে।

টাঙ্গা ছুটছে তো ছুটছেই। এই কি দু' কিলোমিটার পথ? কিন্তু বলার কিছু নেই, জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। বলির পাঁঠাকে যেমন কামার টানতে টানতে হাড়কাঠের দিকে নিয়ে যায় এদেরও তেমনি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপায় নেই—উপায় নেই।

উপায় ছিল। বাপ্পা যেখানে বসেছিল ইচ্ছে করলে সে ছুটন্ত

টাঙ্গা থেকে টুপ্ করে লাফিয়ে পড়তে পারত। গাড়োয়ান টেরও পেত না। তারপর ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে গাড়িতে ফিরে গিয়ে খবর দিতে পারলেই হত।

কিন্তু রঞ্জুকে ফেলে বাপ্পা পালাতে পারল না। ও তো মনের আনন্দে বসেছে গিয়ে গাড়োয়ানটার পাশে।

একটু পরে একটা গির্জের চূড়ো দেখা গেল। টাঙ্গার গতি কমে এল। গির্জাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বাপ্পা দেখল এত বড়ো গির্জে এর আগে কখনো তার চোখে পড়ে নি। কিন্তু গির্জাটা খুবই পুরনো। অনেক জায়গায় ফাটল ধরেছে। পরিত্যক্ত গির্জা। এখানে যে কতকাল লোকে আসে নি তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

টাঙ্গা এসে সেই গির্জার সামনে দাঁড়ালো। এইবারই যা ঘটবার তা ঘটবে। বাপ্পা স্পষ্ট লক্ষ্য করল গাড়োয়ানের মুখটার কী অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে এরই মধ্যে। গম্ভীর থমথমে—রাগ-রাগ—। বুঝতে পারল এইবার এমন-কিছু বলবে যা তারা করতে বাধ্য হবে।

টাঙ্গা থামতেই রঞ্জু বললে, এ কোথায় আনলে? কোথায় তোমাদের গোডাউন?

গাড়োয়ান সে কথার উত্তর দিল না। শুধু গম্ভীর গলায় বলল, get down।

দু'জনেই নামল। আর সঙ্গে সঙ্গে গির্জের ভেতর থেকে সকালের সেই দুটো লোক বেরিয়ে এল। তাদের মুখে হাসি নেই—কথা নেই। একজন এগিয়ে গেল রঞ্জুর দিকে। আর একজন এগিয়ে এল বাপ্পার দিকে।

বাপ্পা বুঝতে পারল ক্লোরোফর্ম করবে। ঐ যে রুমাল—ঐ যে কেমন মিষ্টি ঝাঁজালো একটা গন্ধ····। রুমালটা এগিয়ে আসছে তার নাকের কাছে। ····কী আশ্চর্য, সব জেনেও বাধা দেবার উপায় নেই। বাধা দিলেও নিষ্কৃতি নেই। তার চেয়ে—বাপ্পা ঢলে পড়ল।

॥ তিন ॥

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে নামল। আকাশে মেঘ থম্ থম্ করছে। চারদিক অন্ধকার। ছেলেদুটো তো এখনো ফিরল না? বাবার মন চঞ্চল। মা ছট্‌ফট্ করছে। অথচ কাউকে কিছু বলতে পারছে না। বললেই গাড়ির অন্য সকলে স্তোকবাক্য দেবে—আসবে—আসবে। এত চিন্তা কেন?

কিন্তু মা-বাবার মন—অত সহজে কি নিশ্চিন্ত হতে পারে?

রঞ্জুর বাবা সারা বগিতে গম্ভীরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন।

এক একবার চলে আসছেন নিজেদের কুপে। —এখনো ফেরে নি।

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, না। কি হল ওদের? সাতটা বেজে গেল!

রঞ্জুর বাবা গুম্ হয়ে থাকেন। আবার পায়চারি করেন। আর বারে বারে তাকান প্ল্যাটফর্মের দিকে। জমাট অন্ধকার—। ঐ অন্ধকারের ভেতর থেকে ছেলে দুটো কখন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে? আসবে তো?

—হ্যাঁ গো! কি হল? কোথায় গেল ওরা?

মাও আর বসে থাকতে পারছেন না। উঠে এসেছেন। মুখ কালিবর্ণ।

রাত সাড়ে সাতটা। রঞ্জুর বাবা আর গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারলেন না। নেমে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। টর্চ ফেলতে লাগলেন—যদি ওদের দেখা যায়।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা—বাপ্পা রঞ্জু হারিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে সবাই নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। এসে দাঁড়াল রঞ্জুর বাবার পাশে। সেই পুলিশ অফিসার মিস্টার দফাদারও ব্যস্ত হয়ে নেমে এলেন। —কী ব্যাপার? আমায় তো একটু বলবেন।

রঞ্জুর বাবা কাঁদো কাঁদো হয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। শুনে মিস্টার দফাদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, এসব জায়গায় বেশ কিছু স্মাগলার আছে। সাংঘাতিক তারা। শুনেছি অল্পবয়সী ছেলেদের চুরি করে আটকে রাখে। তারপর তাদের দিয়ে স্মাগলিং-এর কাজ করায়। যাই হোক, এখনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কোন্ পথে গেছে জানেন?

রঞ্জুর বাবা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। —কিচ্ছু জানি না—কিচ্ছু জানি না।

এমনি সময়ে হেড-ঠাকুর এসে রঞ্জুর বাবার হাতে একটা চিরকুট দিল। খোকাবাবু এটা দিয়ে গেছে।

—কোন্ খোকাবাবু?

—বাপ্পা খোকাবাবু।

রঞ্জুর বাবা তাড়াতাড়ি চিরকুটটা খুলে ফেললেন। কিছুই নেই। শুধু একটা নকশা। স্টেশন। তীর চিহ্ন দিয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দেখানো। দক্ষিণের কাঁচা রাস্তাটা তীর চিহ্ন দিয়ে বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর গাছের নীচে টিনের ছাউনির দোকানগুলো। একটাতে দেখানো হয়েছে নতুন কাপড়ের থান ঝুলছে।

—বাঃ! এই তো ডিরেকশান। পুলিশ অফিসার উৎসাহিত হলেন। দাঁড়ান, রিভলবারটা নিয়ে আসি। টর্চ?

সঙ্গে সঙ্গে জনা কুড়ি প্যাসেঞ্জারের হাতে টর্চ জ্বলে উঠল।

—রেডি?

—হ্যাঁ, রেডি।

মিস্টার দফাদার রিভলবার হাতে নেমে এলেন। —আসুন আপনারা। Quick।

ঘড়িতে তখন আটটা বেজে পনেরো।

॥ চার ॥

অন্ধকার একটা ঘরের মতো জায়গায় বাপ্পা আর রঞ্জু চুপচাপ বসে। স্যাঁতসেতে মাটি। ঘরটা যে মাটির নীচে তা বুঝতে বাকি ছিল না। একটা ভাঙা সিঁড়ি আছে ওপরে ওঠার। কিন্তু সিঁড়ির মুখ বন্ধ। কিসে বন্ধ তা ঠাওর হয় না। টাঙ্গা থেকে নামার পর সেই যে লম্বা লোকটা মুখে রুমাল চেপে ধরল সেই পর্যন্ত মনে পড়ে। তারপর সব অন্ধকার। জ্ঞান হবার পর বাপ্পা উঠে বসল। তখনো তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। শরীরটা দুর্বল। উঠে দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে রঞ্জুর জ্ঞান ফিরেছে। বেচারি রঞ্জু। সে প্রথমে খুব চিৎকার করেছিল—কে আছ, বাঁচাও! —যদি বাইরে কেউ শুনতে পায়। কিন্তু বন্ধ দরজা ঠেলে সে শব্দ বাইরে পৌঁছয় নি। এখন আর চিৎকার করতে পারছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে— মা—মা গো!

কিন্তু বাপ্পা চিৎকার করল না একবারও। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। সে জানে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে থাকে ততক্ষণই সে বাঁচার আশা করতে পারে। বাপ্পা দেখল বসে বসে কাঁদলে চলবে না। সেই বদমাইশ লোকগুলো নিশ্চয় আবার আসবে। তারপরই তাদের আসল কাজ শুরু হবে—যে উদ্দেশ্যে তাদের আনা।

কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে কী বাপ্পা এখনো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যাই হোক, সে তো কোনোরকমে দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। ভাগ্যি টর্চটা এনেছিল। টর্চ ফেলে চারদিক দেখল। পুরনো ইটের গাঁথনি। নোনা ধরা। যেন পুরনো কবরখানার দেওয়াল।

না, বেরোবার কোনো উপায় নেই।

তাহলে এইখানেই সারারাত্রি—হয়তো পরের দিন কি তার পরের দিনও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।

বাপ্পা কোমরে গোঁজা গুল্‌তি বের করে দুটো বাঁটুল ছুঁড়ল।

একথা মনে হতেই খুব ঘামতে লাগল। শরীর এলিয়ে পড়তে লাগল। অজ্ঞান হবার আগে মানুষের কি এইরকম অবস্থা হয়?

স্টেশন এখান থেকে কত দূর? রাতই বা এখন কত? তাদের গাড়ি কি ছেড়ে দিয়েছে?

ভাবতে ভাবতে বাপ্পার শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

এমনি সময়ে কোথায় যেন অস্পষ্ট কুকুরের ডাক শোনা গেল—ঘে—উ—উ! শব্দটা যেন ক্রমশ এগিয়ে এল। ঘেউ—ঘে—উ—ঘে—উ—

ডাকটা কি সিঁড়ির ওপর এসে থামল? বাপ্পা আবার কান খাড়া করে উঠে বসল।

এবার মনে হল সিঁড়ির মুখে কুকুটা যেন আঁচড়াচ্ছে। আবার শব্দ—ঘে—উ—

বাপ্পা লাফিয়ে উঠল, রঞ্জু, নিশ্চয় আমাদের সেই কুকুরটা! বলে রঞ্জুর হাত ধরে জোরে টান দিল।

—আ তুঃ! —আ তুঃ! কুকুরটার ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করল বাপ্পা। কিন্তু ক্লান্ত স্বর বাইরে বেরোল না। ছিটকে ফিরে এল।

কুকুরটা তখনো পা দিয়ে কিছু একটা সরাবার চেষ্টা করছিল। বাপ্পা কোমরে গোঁজা গুলতি বের করে দুটো বাঁটুল ছুঁড়ল। যদি কুকুরটা বুঝতে পারে। খট্ খট্ করে বাঁটুল দুটো শক্ত কিসে যেন লাগল। বাঁটুল দুটো গুঁড়িয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাটি আঁচড়ানোর শব্দ থেমে গেল—কুকুরের ডাকও নেই।

—হায় হায় রঞ্জু! কী ভুলই করলাম রে! কুকুরটা শব্দ শুনে নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।

বলে বাপ্পা দু হাত মুঠো করে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল।

রঞ্জু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কুকুরটা যদি সত্যিই আমাদের সেই কুকুর হয় তাহলে সে ভয় পেয়ে পালাবে না। আবার আসবে।

এ কথায় বাপ্পা যেন অনেকখানি ভরসা পেল। রঞ্জুর হাত ধরে অন্ধকারে সিঁড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

। পাঁচ ॥

—আর মাত্র এক ঘণ্টা সময় ট্রেন ছাড়তে। Quick—Quick! মিস্টার দফাদার হাঁক দিলেন।

Quick তো! কিন্তু নক্শার চিহ্ন এই পর্যন্তই। এই সেই দোকানগুলো। সব দোকানই বন্ধ। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। কোথায় খুঁজবে ওদের?

—দাঁড়ালে হবে না। চলুন, এগোই। যা হোক একটা সূত্র পাওয়া যাবেই।

কিন্তু হায়! কোন্ দিকে এগোবে? দু দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে যে। এক মুহূর্ত মিস্টার দফাদার থমকে দাঁড়ালেন। তার পরেই বললেন, দশজন বাঁ দিকে যান, আর দশজন আমার সঙ্গে আসুন।

সেই রকমই করার জন্যে—অর্থাৎ কে কোন্ দিকে যাবে—দুটো ব্যাচ তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ দেখা গেল দূরে অন্ধকারে হিংস্র প্রাণীর চোখের মতো কী যেন জ্বলছে। সবাই ভয়ে আঁৎকে উঠল। কী ওটা?

মিস্টার দফাদার রিভলবার বের করলেন।

ইতিমধ্যে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন শূন্যে ভাসতে ভাসতে কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা টর্চের আলো তাকে চারি দিক থেকে বিদ্ধ করল।

না, ভয়ের কিছু নেই। একটা রোগা লিক্‌লিকে কালো কুকুর। কুকুরটা কোনো ডাকাডাকি করল না। মিস্টার দফাদারের পায়ের কাছে একবার ঘুরেই যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটতে লাগল।

খ্যাপা কুকুর নাকি? লোকে ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিল। মিস্টার দফাদার ইশারায় ইঁট ছুঁড়তে বারণ করলেন। বললেন, কুকুরটা কিছু জানাতে চাচ্ছে। Let us follow.

সকলেই কুকুরটার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। কিন্তু মুশকিল—মাঝে

মাঝে কুকুটা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় টর্চ জ্বেলেও তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তারপর যখন দিশেহারা হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই দেখে কুকুরটা ঠিক ওদের সামনে আসতে আসতে ছুটছে। তার লেজটাও অদ্ভুত। কুণ্ডুলি পাকানো।

কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা তাদের যেখানে এনে ফেলল সেটা পুরনো মস্ত একটা গির্জে। আর তার পাশেই—টর্চের আলো পড়ল—ও বাবাঃ! এ যে একটা কবরখানা!

কুকুরটা কিন্তু থামল না। ওদের এক রকম টানতে টানতে নিয়ে এল সেই গির্জের মধ্যে। তারপরে এক জায়গায় যেখানে একটা প্রকাণ্ড কাঠ পড়েছিল সেখানে আঁচড়াতে লাগল। তাই দেখে কুড়িটা মানুষের চল্লিশটা হাত লেগে পড়ল। কাঠের পাটাতন সরে গেল। ভেতরে সুড়ঙ্গ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা কিশোরের কাঁপা কাঁপা আর্তস্বর ছিটকে বেরিয়ে এল—কে আছ বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ঠিকরে পড়ল ভেতরে। —কোনো ভয় নেই। আমরা এসে পড়েছি।

বলেই মিস্টার দফাদার দু-তিন জনকে নিয়ে নীচে নেমে গেলন।

একে একে তোলা হল বাপ্পা আর রঞ্জুকে। সবাই সুড়ঙ্গ থেকে সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে উঠে আসছে হঠাৎ মিস্টার দফাদারের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গর এক কোণে। তিনি চমকে উঠলেন—who is there? ওখানে পড়ে কে?

সবাই আবার নেমে এল। অবাঙালি একটা ছেলে। তখনো অজ্ঞান অচৈতন্য। তার পায়ে একপাটি স্লিপার। অন্ধকারে বাপ্পারাও দেখতে পায় নি ওকে।

তিরুনেলভেলি থেকে ঠিক দশটায় ওদের গাড়ি ছেড়েছে। এরা ঠিক সময়ের দশ মিনিট আগেই হয়তো পৌঁছতে পারত। কিন্তু মিস্টার দফাদারের তখনো দুটো কাজ বাকি ছিল। প্রথম কাজ

অবাঙালি ছেলেটিকে স্টেশনমাস্টারের কাছে জিম্মা করে দেওয়া। দ্বিতীয় কাজ স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকেই নিজের পরিচয় দিয়ে থানায় ফোন করে সব জানানো। সব শুনে থানা জানালো এখনি সশস্ত্র পুলিসভ্যান যাচ্ছে।

ট্রেন চলেছে মাদ্রাজের দিকে। মাদ্রাজ থেকে হাওড়া। গাড়িসুদ্ধ, সবাই ভিড় করে এসেছে বাপ্পাদের কাছে। বাপ্পার মুখে সব ঘটনা শুনছে। শিউরে উঠছে ভয়ে। হ্যাঁ, ভাগ্যি কুকুরটা ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গির্জে থেকে ফেরার পথে কুকুটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ এক ॥

কলকাতায় সুন্দরকাকার কাছে বেড়াতে এসে বাপ্পা তো আনন্দে আটখানা। সে মফস্বলের ছেলে। কলকাতায় যদি-বা কখনো-সখনো এসেছে থাকা হয় না। এবারে টানা প্রায় দুসপ্তাহ থাকতে পেয়ে সে একেবারে যেন কলকাত্তাই হয়ে উঠল।

সুন্দরকাকা তার নিজের কেউ নয়। গ্রাম-সম্পর্কে কাকা। বহুকাল পরে তিনি দেশে এসেছিলেন তাঁর পৈত্রিক জমিজমার ব্যবস্থা করতে। সেই সূত্রেই বাপ্পার সঙ্গে আলাপ। বাপ্পাকে তাঁর খুব ভালো লাগলো। তারপর তিনি যখন বাপ্পার এক-একটি অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলেন তখন তাঁর বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি মহা উৎসাহে চাপা উত্তেজনায় বললেন, দ্যাখো বাবা, আমার বাড়িতে কিছু কাল ধরে বড়ো অদ্ভুত উপদ্রব হয়। কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারি না।

—ভূতের উপদ্রব ?

—না—না, ভূত-টুত আমি মানি না। তা ছাড়া কলকাতায় আবার ভূত কোথায়? এ উপদ্রব মানুষের। প্রায়ই দেখি আমার আলমারির তালা খোলা। অথচ কিছু চুরি যায় না।

—তালা খোলা দেখার পর কি করেন?

—আবার তালা লাগাই।

—ঐ তালা, না নতুন তালা?

—না, ঐ তালাই লাগাই। কাঁহাতক আর নতুন তালা কিনি।

—পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?

সুন্দরকাকা তাঁর কালো মুখখানা প্যাঁচার মতো করে বললেন, এ ত সামান্য ব্যাপার—এ আর পুলিসকে কি বলব। একটা টাকাও চুরি যায় না কোনো দিন।

—বাড়িতে আর কে থাকে?

—কে আর থাকবে? এক ঐ ভুবন—আমার ভাইপো।

বাপ্পার বাবাও সামনে বসে চা খাচ্ছিলেন। বললেন, আপনার তো নিজের ভাইপো নয়।

সুন্দরকাকা বললেন, না। নিজের বলতে তো কেউ নেই। তাই ঐ জ্ঞাতি ভাইপোটাকেই কাছে রেখেছি। সেও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে গেল। বড়ো ভালো শান্ত ছেলে।

বাপ্পার বাবা হেসে বললেন, ভুবনের ভাগ্য ভালো। আপনার অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

সুন্দরবাবু একটু হেসে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, তা বলতে পার। তবে কিছু আমি রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে আমার স্ত্রীর নামে দান করব ভাবছি। যেমন ঠিক করেছি এখানকার জমিগুলোয় একটা হাসপাতাল করে দেব।

বাপ্পার বাবা শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, আপনার এই মহৎ ইচ্ছে ভগবান পূর্ণ করুন।

—হ্যাঁ, সবই তাঁর ইচ্ছে। বলে সুন্দরবাবু দু হাত কপালে ঠেকালেন।

তারপর বাপ্পাকে বললেন, তা বাবা, তোমার তো এখন লম্বা ছুটি। চলো না আমার কাছে। তুমি থাকলে যদি তালা খোলাটা বন্ধ হয়। বলে বাপ্পার বাবার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকাকালেন।

বাবা বললেন, আপনার কাছে যাবে তাতে আর আপত্তি কি? শুধু ভয় করে কলকাতার গাড়ি-ঘোড়া—

সুন্দরকাকা হা হা করে হাসলেন। হাসির দাপটে তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠল। —কলকাতায় আর এখন গাড়ি ঘোড়া নেই। ট্রাম বাস লরি—টিউবরেল!

বাপ্পার বাবা একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। বললেন—ঐ হল। সবই গাড়ি ঘোড়ার মত।

সুন্দরকাকা বললেন, কোনো ভয় নেই। ওর রাস্তায় বেরোবার দরকারই হবে না। মস্তবড়ো কম্পাউণ্ড, সেখানেই খেলবে বেড়াবে।

কম্পাউণ্ডের লোভে নয়, তালা খোলার রহস্য ভেদের আগ্রহেও নয়, বাপ্পা রাজি হয়ে গেল অন্য কারণে। সেবার তিরুনেলভেলিতে ট্রেনে সেই যে পুলিস অফিসার মিস্টার দফাদারের সঙ্গে ভাব হয়েছিল তারপর থেকে দুজনের মধ্যে অনেক চিঠি আনাগোনা করেছে। তিনি তো কেবলই বাপ্পাকে লিখছেন—কলকাতায় কখনো এলে যেন নিশ্চয় দেখা করে। অনেক সত্যিকার রোমহর্ষক গল্প জমে আছে।

সেই লোভেই বাপ্পা সুন্দরকাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলো।

সিঁথি এলাকায় সুন্দরকাকুর বিরাট কম্পাউণ্ডওলা বাড়ি। জায়গাটায় লোক বসতি কম। একতলা পুরনো বাড়ি। বড়ো বড়ো ঘর, ও গরাদবিহীন জানলা। হু হু করে বাতাস খেলছে। বাড়ির পিছনে একটা জলা। সেখানে ধোপারা কাপড় কাচে। ও পাশে অবশ্য নতুন কন্স্ট্রাকশন উঠছে। ফ্ল্যাট বাড়ি-টাড়ি হবে।

এই রকম নিরিবিলি জায়গায়, অত বড়ো বাড়িতে সুন্দরকাকা একলা কি করে থাকে ভেবে বাপ্পা অবাক হল।

সুন্দরকাকা অবশ্য ঠিক একা থাকেন না। তিনি বলেছিলেন

এখানে ওঁর এক ভাইপোও থাকে। কিন্তু তিনি বলেন নি ভাইপোটি ছাড়াও আরও একজন থাকে যে ওঁকে দেখে—বাজার করে—রান্না করে। সে লোকটা অবশ্য বাড়ির মধ্যে থাকে না। থাকে কম্পাউণ্ডের এক কোণে রান্নাঘরের পাশে। এইজন্যেই বোধ হয় তাকে ফ্যামিলির মধ্যে গণ্য করেন নি।

বাপ্পার স্বভাবটা বড্ড কৌতূহলী। এসেই ভাইপোটির খোঁজ। কিন্তু তার আর দর্শন মেলে না। দুদিন পর তাকে আবিষ্কার করল বাড়ির সবচেয়ে পিছনের একটা ঘর থেকে। এ ঘরটার পিছনে আবার একটা পরিত্যক্ত ঘর। সেখানে কেউ থাকে না। ভাঙা টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ডাঁই করা। ডান পাশে ঠানা বারান্দা। অর্থাৎ সুন্দরকাকার ঘর থেকে ভাইপোর ঘরটা বিচ্ছিন্ন।

ভাইপো ভুবনকে দেখে বাপ্পার ভালো লাগল না। রোগা-রোগা চেহারা। মুখে না-কামানো দাড়ি। সবসময়ে রোগী-রোগী ভাব। ঘরের মধ্যেটাও নোংরা। মেঝেতে কমলালেবুর খোসা, ছেঁড়া কাগজ, ওষুধের মোড়ক। আর টেবিলের ওপর কত রকমের যে ওষুধের শিশি তার ইয়ত্তা নেই।

তবু মানুষটার সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়েছিল কিন্তু ভদ্রলোক তো কোনো কথা বললই না, বরঞ্চ এমনভাবে ভুরু কুঁচকে তাকালো যে বাপ্পা পালিয়ে এলো। সেই থেকে বাপ্পা আর ও মুখো হয় না।

সুন্দরকাকুর ঐ ঠাকুর-কাম-চাকরটি আর এক চীজ। তার সাজসজ্জার ঘটা কী! যেন এ বাড়ির ঐ একমাত্র বংশধর! সবসময়ে সিগারেট—গুন গুন করে হিন্দি গান—মাঝে মাঝে শিস দেওয়া। কে বলবে সে এ বাড়িতে কাজ করে। নামটিও সুন্দর—'ভ্রমর'! সুন্দরকাকুর খুব পেয়ারের। যখন তখন ডাকে—এই ভোমরা, ডাকলে শুনিস না কেন?

ভ্রমর মাথা চুলকে বলে—কত দূরে থাকি। কি করে শুনব? বলছি ত একটা কলিং-বেল করতে।

সুন্দরকাকা হাসেন।

বেচারি বাপ্পা। এই ভ্রমরও তাকে ভালো চোখে দেখলো না। সে আসার পর থেকে ভ্রমরের মেজাজ যেন দ্বিগুণ চড়ে গেল। বাপ্পাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বাপ্পা বুঝতে পারে না তাকে দেখে এদের এত রাগ কেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য বাপ্পার আসল কাজ সারা হয়ে গেছে। সেই পুলিস অফিসারের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করে এসেছে। বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ।

বাপ্পা ভারি খুশী। তিরুনেলভেলির ট্রেনের সেই বন্ধুকে একটা চিঠি লিখে ফেলল। মিস্টার দফাদারের কথা লিখে শেষে লিখল— কলকাতায় এসেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। বাপ্পার বেশ ভালোই লাগছে। খায় দায় আর ঘুরে ঘুরে কলকাতার রাস্তা চেনে। তার খুব ইচ্ছে লালবাজার পুলিস-স্টেশনটা একবার দেখে। ওটা যেন তার কাছে গল্পে-পড়া স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডের মতো। কিন্তু সে দেখা হয়ে উঠে না।

বাড়িতে সুন্দরকাকুর সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা হয় না। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি বাইরে বাইরে থাকেন। কখনো দক্ষিণেশ্বর কখন বেলুড় মঠ, কখনো কালীঘাট। কোথাও হরিসভা হচ্ছে কিংবা কীর্তন হচ্ছে খবর পেলেন তো ছুটলেন। বাড়িতেও নিত্য নানা লোকের আনাগোনা। সব চাঁদা আদায়ের ধান্দা। আজ অমুক সেবাশ্রম, কাল তমুক মঠ, পরশু মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এ লেগেই আছে। কেউ এসে হাত পাতলে শূন্য হাতে সে ফেরে না।

এখানে আসার আগে এ বাড়িতে যে আলমারির তালা খোলার রহস্য শুনেছিল, বাপ্পারও আর তা খেয়ালই ছিল না। হয়তো বাপ্পার আসার পর আর কেউ তালা খোলার চেষ্টা করে নি।

বাপ্পার বেশী কৌতূহল নিয়েই মুশকিল। সুন্দরকাকুকে একটু আলাদা পেলেই ভুবন সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করে।—আচ্ছা, উনি ওরকম এক কোণে পড়ে থাকেন কেন? উনি আমাদের সঙ্গে

কথা বলেন না কেন? আমাকে দেখলে বিরক্ত হন কেন? ওঁর কি রোগ? অত ওষুধ কেন?

সব প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায়? সুন্দরবাবুও এক এক সময়ে বিরক্ত হন।

—আপনার কাছে কত লোক আসে কিন্তু ভুবনদার কাছে কেউ আসেন না কেন? আপনার সঙ্গে কি ওঁর ঝগড়া?

আবার কোনো কোনো দিন ভ্রমরকে নিয়ে পড়ে।

—ও লোকটা বিশেষ সুবিধের নয় কাকু।

সুন্দরকাকু বিরক্তি চেপে গম্ভীর গলায় বলেন, কেন? ও আবার তোমার কী পাকা ধানে মই দিলো?

বাপ্পা কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে টেনে টেনে বলে—ও যেন কে-ম-ন ধারা। বড্ড চালিয়াৎ।

—তাতে তোমার কি?

—না, কিছু নয়। এমনিই বললাম।

একদিন বাপ্পা বললো, কাকু, আজ এত দিন পর একজনকে দেখলাম ভুবনদার ঘরে ঢুকতে।

—আঁা:! সুন্দরকাকু একটু অবাক হলেন।

—কখন দেখলে?

—আপনি যখন বেরিয়ে গেলেন তার একটু পরেই।

—কি নাম?

—তা কি করে জানবো?

সুন্দরকাকুর কপালে চিন্তার রেখা পড়লো। মনে মনে বললেন, ভুবনের কাছে কে আবার আসবে?

—কখন গেল দেখেছিলে?

—হুঁ। সন্ধ্যের একটু আগে।

—এতক্ষণ ছিল! সুন্দরকাকুর কপালের চামড়া ভাঁজ ফেলেই চললো।

—আচ্ছা, লোকটাকে কি কখনো আমার কাছে আসতে দেখেছ ?

বাপ্পা এপাশ থেকে ওপাশ মাথাটা একবার নাড়লো। অর্থাৎ 'না'।

সুন্দরকাকু একেবারে থমকে গেলেন। তারপর যেন আপন মনেই বললেন, ওর কাছে আবার কে আসতে আরম্ভ করলো ?

বাপ্পা চট্ করে বললো, ওঁর কাছেও তো কেউ কেউ আসতে পারে। তা নিয়ে এত ভাবছেন কেন ?

—না বাপু, ভাববো কেন ? তবে ওকে তো বহু দিন দেখছি। শুয়ে বসে শুধু ডাক্তারি বই পড়ে আর ওষুধ খায়। বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই—এমন কি আমার সঙ্গেও প্রায়।

বাপ্পা সহজভাবে বললো, তা এখন হয়তো বন্ধু পেয়েছেন এক-আধজন।

—কিংবা হয়তো কেউ বিনা পয়সায় ডাক্তারি পরামর্শ নিতে আসছে। বলে সুন্দরকাকু একটু হাসলেন। যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

সুন্দরকাকু নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্তু বাপ্পার মনে খোঁচ থেকে গেল। তার কেবলই মনে হতে লাগলো ভুবনদার কাছে কেউ আসে জেনে সুন্দরকাকু চমকে উঠলেন কেন ?

সুন্দরকাকুকে একলা পেয়ে একদিন বাপ্পা বললো, আপনি আজকাল খুব ভাবেন।

সুন্দরকাকু বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, বেড়াও। আমাকে লক্ষ্য রাখার দরকার নেই।

—না, লক্ষ্য করবো কেন ? লক্ষ্যে যে পড়ছে। আপনার দু'চোখ বসে যাচ্ছে; চোখের কোণে কালি পড়ছে। আপনার বোধ হয় রাতে ঘুম হয় না।

সুন্দরকাকু মাথা নেড়ে বললেন, কে বলেছে ঘুম হয় না ? বেশ ঘুমোই।

—তাহলে নিশ্চয় অন্য কোনো রোগ ঢুকেছে।

সুন্দরকাকু চেঁচিয়ে উঠে সামনের আয়নায় এক পলক মুখটা দেখে নিয়ে বললেন—না, আমার কোনো রোগ নেই।

—রোগ নেই তো গুঁড়ো ওষুধ খান কেন? বাপ্পাও সমান তালে চেঁচিয়ে উঠলো।

—আমি ওষুধ খাই! পাগল হলে নাকি?

বাপ্পা উত্তর না দিয়ে এক ছুটে সুন্দরকাকার ঘর থেকে একটা কাঁচের গ্লাস এনে দেখালো গেলাসের গায়ে গুঁড়ো পাউডার লেগে রয়েছে। রাত্রে তিনি এই গেলাসেই জল খেয়েছিলেন।

সুন্দরকাকার চোখ বিস্ফারিত। তিনি আর্তনাদ করে উঠে বললেন, আমি তো কোনো ওষুধ খাই না। তাহলে খাবার জলে ওষুধ মেশালো কে?

বাপ্পা নিচু গলায় বললো, কাকু, এ নিয়ে এখনই হুজ্জোৎ করবেন না। তাহলে আপনার শত্রুরা সাবধান হয়ে যাবে।

সুন্দরকাকুর অমন নিটোল গোল মুখখানি মুহূর্তে লম্বা হয়ে গেল।

—শত্রু! তুমিও কি মনে করছ আমার পেছনে কেউ লেগেছে?

বাপ্পা একটু হাসলো। বললো, সে তো আপনিই ভালো করেই জানেন। আপনার আলমারি যে বারে বারে খোলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য কি বোঝেন না?

সুন্দরকাকু ভয়-পাওয়া ছেলের মতো মাথা নাড়লেন। —না, সত্যিই জানি না।

—যে কারণেই হোক আপনার আলমারি যে খুলতো সে আর খোলার সুবিধে পাচ্ছে না। তাই এখন অন্য উপায় খুঁজছে।

সুন্দরকাকার মুখ আরো কালো হয়ে উঠলো। বললেন, কিন্তু আমার আলমারিতে এমন কিছু নেই যে লোকে চুরি করতে আসবে।

বাপ্পা বলল, নেই ঠিকই। কিন্তু যে চুরি করতে আসে তার ধারণা— নিশ্চয় কিছু আছে।

বাপ্পা এক ছুটে কাঁচের গ্লাস এনে দেখালো।

—কিন্তু—

সুন্দরকাকা একটু থামলেন। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন,

কিন্তু কি থাকতে পারে? কেই বা চুরি করতে আসে; কেই বা গেলাসের জলে ওষুধ মেশায়, কেনই বা মেশায়?

বাপ্পা বললো, করার মধ্যে তো দু জন। এক ভুবনকাকা, না হলে ভ্রমর।

—না—না, এ অসম্ভব। ভুবন কেন করবে? ও আমার নিজের লোক। কোনোকিছুতেই থাকে না। তা ছাড়া চিররুগ্ন। আর ভ্রমর—সেও খুব ভালো। পুরনো লোক। ও আছে বলেই আমি টিকে আছি।

—আপনি ওকে রোজ যে বাজারের টাকা দেন তার হিসেব পান?

সুন্দরকাকা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, ওসব তুচ্ছ ব্যাপার। ইচ্ছে করেই হিসেব চাই না।

বাপ্পা বললো, এ দুজনের কারো ওপরই যদি আপনার সন্দেহ না হয় তাহলে নিশ্চয় ভুতে করে। বাইরের কেউ তো রাতে এসে আপনার খাবার জলে ওষুধ মেশায় না।

সুন্দরবাবু এবার রেগে উঠলেন। —তুমি কি আমায় শেষ পর্যন্ত ভুতের ভয় দেখাচ্ছ ছোকরা?

বাপ্পা একটু থতমত খেয়ে গেল। এরকম বকুনি খাবে ভাবতেও পারে নি। খুব অভিমান হলো। তখনই মুখ লাল করে সুন্দরকাকুর সামনে থেকে চলে গেল। ঠিক করলো আর এখানে থাকবে না। বাড়ি চলে যাবে।

এই ভেবে দুপুরবেলায় সিঁথিতে পুলিসকাকুর সঙ্গে গল্প করতে গেল।

বিকেলে যখন বাড়ি ফিরছে তখন আকাশ ঘনঘটা করে এসেছে। তাড়াতাড়ি কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা লোক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্‌ করে ভুবনদার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাপ্পার যেন কেমন মনে হলো। তাই তো, সুন্দরকাকা

বাড়ি নেই আর অমনি লোকটা এসেছে। উদ্দেশ্যটা কি?

বাপ্পা তখনই পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ভুবনদাদার ঘরের উত্তর দিকে যে গুদামঘরটা রয়েছে সেখানে গিয়ে ঢুকলো।

একে পুরনো বাড়ি। তার ওপর এ ঘরে যত রাজ্যের ভাঙা টেবিল চেয়ার আলনা শেল্‌ফ ইত্যাদি। সাপ-খোপ আছে কি না তাই বা কে জানে! কিন্তু বাপ্পার তখন অত ভাববার সময় নেই। একটা ভাঙা টেবিলের ওপর অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে লাগলো।

তখন দুজনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা হচ্ছিল। ভুবনদাকে এখন দেখলে কে বলবে সে একটা রুগী! খুব হাসি হাসি মুখ। দু চোখে শাণিত দৃষ্টি।

অনেক চেষ্টা করেও সব কথা শোনা গেল না। যা দু-চার কথা শোনা গেল তা এই রকম—

ভুবনদা: না—না, তুমি ঠিক বলেছ! আর দেরি নয়।

লোকটা: আপনার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেলেই—

ভুবন: হ্যাঁ, দিলাম। মিশনের লোকদের সঙ্গে····যোগাযোগ···· তাদের আগেই······

লোকটা: হ্যাঁ, আমি রেডি।

তারপরই ভুবনদা উঠে আলমারি খুলে কতকগুলো নোট লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিলো। লোকটা অমনি তাড়াতাড়ি বাঁ হাতেই খপ করে নোটগুলো তুলে নিলো।

বাপ্পা কেন কেন একটু অবাক হলো তারপর—

তখনো দিব্যি বৃষ্টি পড়ছে। লোকটা তারই মধ্যে ঝট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাপ্পা অনেক কিছু ভাবতে লাগলো। এই যে ব্যাপারটা আজ সে স্বচক্ষে দেখলো সে কথাটা সুন্দরকাকাকে বলবে

কি না। বলে ফেললে নিশ্চিন্দি। তার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

কিন্তু বলারও একটা অসুবিধে আছে। প্রথমতঃ, কাকু বিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয়তঃ, তার ওপর কাকু আরো চটে যাবেন। তৃতীয়তঃ, উনি এমন চেঁচামেচি করবেন যে সব ফেঁসে যাবে। চতুর্থতঃ—এমনও হতে পারে ঐ ভুবনদা তাকেই তাদের বাধা বুঝে সাবড়ে দেবে।

তাই বাপ্পা ঠিক করলো কথাটা প্রকাশ করবে না। আরো ঠিক করলো কাকু যতই তার ওপর চটুন সে এখন কাকুকে এই বিপদের মুখে ফেলে চলে যাবে না। এ বিপদ থেকে তাঁকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—বিপদটা কি ধরনের—কিসের জন্যে, তা বুঝে উঠতে পারছে না।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সুন্দরকাকা একটা ট্যাক্সি করে ফিরলেন। বোধ হয় কোনো ধর্মসভায়-টভায় গিয়েছিলেন। ফিরেই সোজা চলে এলেন বাপ্পার ঘরে।

—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?

বাপ্পা ধড়মড় করে উঠে বসলো। —না।

সুন্দরকাকু মশারিটা একটু সরিয়ে ওর বিছানার এক কোণে বসলেন। ওঁকে খুব চিন্তিত আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

—তোমাকে ওবেলা বকেছিলাম তার জন্য সারা দিন কষ্ট পেয়েছি। কিছু মনে করো না বাবা।

ব্যাস! বাপ্পার মন অমনি গলে গেল। একটু আগেই সে যা যা ভেবেছিল সব উল্টে পাল্টে গেল।

চাপা গলায় বললো, কাকু, সেই লোকটা আজ আবার ভুবনদার কাছে এসেছিল।

সুন্দরকাকা চমকে উঠলেন। দেখে মনে হলো বেশ ভয় পেয়েছেন।

একটু সামলে নিয়ে বললেন, কখন এসেছিল ?

—বিকেলের দিকে। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যেই এসেছিল।

—গেল কখন ?

—আধ ঘণ্টা পরে। বৃষ্টির মধ্যেই। বাপ্পা থামলো। ইস্! অনেক কথা বলে ফেলেছে। না, আর কিচ্ছু বলবে না।

—তোমার কি মনে হয় ? কেন এত আসছে ভুবনের কাছে ? ভুবনই বা আমায় কিছু বলছে না কেন ?

—কি করে বলবো ? ওরা দুজনে যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

—কিসের ষড়যন্ত্র ? আমি তো কারুর সাতেপাঁচে নেই। লোকে বিষয়-সম্পত্তির জন্যে ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ভুবন তো জানে আমার সব ওই পাবে।

—হয় তো তাড়াতাড়ি পেতে চান।

বাপ্পা এদিক ওদিক তাকালো।

—আমার মরা পর্যন্তও অপেক্ষা করবে না ?

—না।

—আশ্চর্য। টাকা নিয়ে ওইবা কি করবে ? ঐ তো শরীর। ওর তো খাবারও কেউ নেই।

সুন্দরকাকু একটু থামলেন। তারপর বললেন, ও যদি সত্যিই আমার শত্রুতা করে তাহলে তো দুধকলা দিয়ে সাপ পুষে লাভ নেই। কালই ওকে তাড়াবো।

বাপ্পা লাফিয়ে উঠলো। বললো, না, কক্ষণো না। তাহলেই সব কেঁচে যাবে।

সুন্দরকাকু উত্তেজিতভাবে কি বলতে যাচ্ছিলেন বাপ্পা ইশারায় চুপ করতে বললো। —কার যেন পায়ের শব্দ—

দরজা ঠেলে ভ্রমর ঢুকলো। খুব নরম গলায় বললো, আপনার খাবার দিয়েছি।

সুন্দরকাকু কিছু বলার আগেই বাপ্পা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়লো। সুন্দরকাকু খেতে চলে গেলেন।

চার দিন পর।

সুন্দরকাকু এখন প্রায় অতি সাধারণ কথাও বাপ্পাকে জানিয়ে রাখেন। যেমন একদিন বললেন, তারকেশ্বর যাচ্ছি। রাত্তিরে ফিরবো।

বাপ্পা বললো, এখন দিনকতক অমন হুট্‌হাট্ করে নাই গেলেন।

সুন্দরকাকা হাসলেন একটু। বললেন, ঠিক আছে। এবার যাই। কথা দিয়েছি। পরে না হয় দূরে কোথাও যাবো না।

আর-একদিন বললেন, খরাত্রাণের জন্য একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমায় খুব করে যেতে বলেছে।

বাপ্পা বললো, আসল কথা তো মোটা চাঁদা চায়। তা পাঠিয়ে দিলেই তো হল।

সুন্দরকাকু হেসে বললেন, শুধু টাকার সম্পর্ক রাখলে কি চলে? দেরি করবো না সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরব।

সেদিন বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ফোন পেলাম কাল বিকেলে ওঁরা এখানে এসে আমায় নিয়ে যাবেন।

—রামকৃষ্ণমিশন!

—হ্যাঁ, ওঁদের কিছু দেবো। বড়ো ভালো প্রতিষ্ঠানটি।

চকিতে বাপ্পার মনে পড়ে গেল ভুবনদার সঙ্গে সেই লোকটার সেদিনের সেই ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কারণটাও যেন কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

—কিন্তু, ব্যাপারটা কি সুন্দরকাকুকে জানিয়ে রাখবে?

—তার বোধ হয় দরকার হবে না। কালই তো তাঁরা এসে পড়ছেন।

—দেবার ব্যাপারটা কালই তো হবে?

—না, কাল আলোচনা হবে। ডায়মণ্ডহারবার রোডে কোথায় ওঁদের একটা আশ্রম আছে। সেখানেই কথাবার্তা হবে। যাক, বাঁচলাম। বেশ কয়েক মাস ধরে লেখালেখিই চলছে। এবার ব্যাপারটা চুকে গেলে বাঁচি।

সুন্দরকাকু একটু থামলেন। তারপর বললেন, এক একবার ভাবছি, ওঁদেরই সব দিয়ে দেবো। ভুবনটাকে এক কানাকড়ি দেবো না। বলে চোখ পাকিয়ে বাপ্পার দিকে তাকালেন—যেন বাপ্পাই সাক্ষাৎ ভুবন হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাপ্পা শুনলো। কিছু বললো না।

—কাল ওরা আসবে ভুবনকেও জানিয়ে রাখি। ওর সামনেই কথাবার্তা হোক। জ্বলুক মনে মনে, কি বল?

বাপ্পা এবারও নীরব।

পরের দিন বিকেলে চারটে নাগাদ একটা গাড়ি এসে ঢুকলো সুন্দরকাকার কম্পাউণ্ডের মধ্যে। গেরুয়া আলখাল্লা পরা তিন জন স্বামীজি নামলেন গাড়ি থেকে। সুন্দরবাবু নিজে অভ্যর্থনা করে তাঁদের ভেতরে এনে বসালেন। বাপ্পা দূর থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলো।

সুন্দরকাকার ঘরেই সবাই বসলেন। ভ্রমর আজ আরো সাজগোজ করেছে। সুন্দরকাকার ইশারায় সে গিয়ে খবর দিতেই ভুবনদাও দিব্যি গায়ে একটা দামী চাদর জড়িয়ে এ ঘরে ঢুকে সবাইকে নত হয়ে নমস্কার করে চেয়ারে বসলেন। আশ্চর্য! এখন আর তাঁকে তেমন রুগী-রুগী লাগছে না। বরঞ্চ মুখ চোখ বেশ ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে।

পাশের ঘর থেকে বাপ্পা রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করছে। তার বিশেষ লক্ষ্য স্বামীজিদের ওপর। এঁদের যেন ঠিক মানাচ্ছে না। এই তো সেবার বেলুর মঠে গিয়ে স্বামীজিদের দেখেছে। তাঁদের ভাবভঙ্গি কথাবার্তা অন্যরকম। দেখলে শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু এরা যেন কিরকম।

এত উঁচু গলায় কথা বলছে কেন? এমন হা হা করে হাসি, চেয়ারে বসে দোলা, একি স্বামীজিদের মানায়?

সুন্দরবাবু নিজে অভ্যর্থনা করে তাঁদের ভেতরে এনে বসালেন।

স্বামীজিদের একজন বললেন, আপনার এ সাধু প্রস্তাব আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছি।

সুন্দরকাকা অমনি সবিনয়ে হাত জোড় করলেন।

—আচ্ছা, আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তো ইনিই। বলে ওঁদের একজন ভুবনকে দেখালেন।

সুন্দরকাকা বললেন, হ্যাঁ। তবে সমস্ত আর রইলো কই? অনেক-খানিই তো আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি।

—আপনার কোনো আপত্তি, কোনো গ্লানি, কোনো অশান্তি নেই তো ভুবনবাবু?

ভুবন মাথা নাড়লেন। বললেন, কিছু মাত্র না। কাকা সবটাই আপনাদের দিয়ে দিলে পারতেন। আমি একা মানুষ, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি করবো?

—সাধু! সাধু!

আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি ইতিমধ্যে কোনো উইল-টুইল করেছেন?

—উইল! সুন্দরবাবু অবাক হলেন।—কিসের উইল?

—এই ধরুন আপনার সম্পত্তি আপনার অবর্তমানে কাকে কাকে দিতে চান—মানে আপনার হঠাৎ মৃত্যু হলে যাতে আপনার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোনো অশান্তি না হয়—

সুন্দরবাবু বললেন, না, সেরকম কিছু করি নি। আর কেই বা আছে আমার। তবে, আপনাদের সঙ্গে কথা হলো। এইবার করবো ভাবছি।

সকলে আবার সাধু সাধু করে উঠলো। শুধু ভুবন একবার মুহূর্তের জন্যে সুন্দরকাকার দিকে তাকালো। উঃ! সে কী ভয়ংকর দৃষ্টি! যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে সুন্দরকাকুর ওপর।

বাপ্পার অশ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়ছে। স্বামীজিরা কি প্রথমেই উইলের খবর নেন? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো সুন্দরকাকার আলমারির তালা খোলার কথা। তবে কি কেউ এত দিন সুযোগ বুঝে আলমারি খুলে উইলের খোঁজ করতো? সেই জন্যেই কি রাত্তির বেলা জলের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে গাঢ় ঘুম পাড়াবার চেষ্টা?

—চলুন তাহলে আমাদের নতুন আশ্রমে। সেখানেই আজ

মহারাজের সামনে পাকা কথা হয়ে যাক। আপনিও তো যাবেন ভুবনবাবু?

ঠিক যা বাপ্পা ভেবেছে। ভুবনবাবু হাত জোড় করে বললেন, না, আমি যেতে পারবো না। শরীরটা খারাপ।

এই সময়ে ভ্রমর প্লেটভর্তি ফলমূল মিষ্টি নিয়ে এল। স্বামীজিরা সাগ্রহে সেগুলি নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। আর সেই সময়েই যে অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটি বাপ্পার চোখে পড়ে গেল তাতে সে চমকে উঠলো।

আরো কয়েক মিনিট....স্বামীজিরা তখন মহা উৎসাহে রসগোল্লাগুলি একটির পর একটি গলাধঃকরণ করছে হঠাৎ বাপ্পা এসে হাজির। সকলের ভুরু কুঁচকে উঠলো। বাপ্পা সুন্দরকাকার কানের কাছে মুখ এনে বললো, কাকু, একবার ভেতরে আসুন।

ব্যস্ত হয়ে সুন্দরকাকু ভেতরে এলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বাপ্পা বললো, কাকু, আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন না—যাবেন না—বিপদে পড়বেন।

সুন্দরকাকা চটে গেলেন—পাগল নাকি! বলে ধমক দিয়ে আবার এদের কাছে এসে বসলেন।

—ছেলেটা কে? স্বামীজিদের একজন অপ্রসন্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

—ও আমার গ্রামসম্পর্কে এক ভাইপো। খুব বুদ্ধিমান। দাঁড়ান, ডাকছি।

এই বলে তিনি বাপ্পা—বাপ্পা—বলে হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন। কিন্তু বাপ্পাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

স্বামীজিদের গাড়িতে সুন্দরবাবু উঠে বসলেন। গাড়ি স্টার্ট নিলো। গাড়িটা কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে একটা বড়ো গলি পার হয়ে বি. টি. রোডে পড়বে—হঠাৎ রাস্তার দুদিক থেকে দুটো পুলিসের জিপ এসে পথ আটকালো। একেবারে উদ্যত রিভলভারের সামনে স্বামীজিরা হকচকিয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না।

দুদিকের ট্রাফিক আটকে প্রকাশ্য রাস্তাতেই সার্চ করা শুরু হল। স্বামীজিদের কাছ থেকে বেরোল রিভলভার আর ছোরা।

সুন্দরকাকা যখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন তখন পুলিসের জিপ থেকে বাপ্পা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সুন্দরকাকার হাত ধরে বললো, আর ভয় নেই, বাড়ি চলুন।

বাপ্পার পরিচিত সেই দফাদার পুলিসকাকু বললেন, সুন্দরবাবু, এই ছেলেটার জন্যে আজ আপনি বেঁচে গেলেন। আপনার বিষয়-সম্পত্তির খানিকটা তো আপনি রামকৃষ্ণমিশনকে দেবেন ঠিক করে-ছিলেন। সেটা দেবার আগেই আপনাকে সরিয়ে দিতে পারলে আপনার ভাইপোটি ষোল-আনা সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হতেন। তাই এই ষড়যন্ত্র। বুঝতেই পারছেন এ সব সাজানো স্বামীজি।

—কিন্তু—আপনি কি করে—

পুলিস অফিসার হাসলেন। বললেন, এখানে এসে পর্যন্ত বাপ্পা রোজই আমায় সব খবর জানিয়ে যেতো। এমন কি আজ যে স্বামীজিরা আসবেন তাও জানতাম।

অফিসারটি একটু থামলেন। তারপর দু'দিকের ভিড় হটিয়ে দিয়ে সুন্দরকাকাকে বললেন, চলুন এবার আপনার ভাইপো ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

পরের দিন বাপ্পা সব ঘটনা জানিয়ে তিরনেলভেলির বন্ধু রঞ্জু আর তার বোন ইভাকে চিঠি লিখতে বসলো। শেষে লিখলো—স্বামীজিরা যে জাল সে সন্দেহ স্বামীজিদের দেখা মাত্র হয়েছিল। কিন্তু ভ্রমরের হাত থেকে প্লেট নেবার সময়ে যখন একজন বাঁ হাত বাড়িয়ে নিলো তখনই তাকে চিনতে পারলাম—এই সেই লোকটা যে চুপিচুপি ভুবনদাদার কাছে ষড়যন্ত্র করতে আসতো। —যে সেদিন বাঁ হাত দিয়েই ভুবনদাদার কাছ থেকে নোটগুলো নিয়েছিল। ব্যস্। তার পরেই ছুটলাম পুলিসকাকুর কাছে।

—শেষ—